অ্যাজ ইউ লাইক ইট

উইলিয়াম শেক্সপীয়ার

ভাবানুবাদ

পৃথ্বীরাজ সেন

আদিত্য প্রকাশালয়

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট • কলিকাতা - ৭৩

দ্বিতীয় মুদ্রণ

ভাদ্র ১৩৭২

প্রকাশক :

শ্রীহরিপদ বিশ্বাস

আদিত্য প্রকাশালয়

২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রাকর :

শ্রীসুদর্শন চন্দ্র গাতাইত ।

দি বি. জি. প্রিণ্টার্স

১৮১ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড ।

কলিকাতা-৭০০০০৪

উপহার

উৎসর্গ

সাগরিকা (ইতু বোন)-কে

স্মৃতিদগ্ধ প্রহরের রোমন্থনে

এক

জায়গায় নাম ফ্রান্স।

কবে কার ?

জানি না।

জানি না ফ্রান্সের সম্রাট কে। জানি শুধু সামন্ত প্রভুরাই এখানকার সর্বময় কর্তা। নিজের নিজের ভূখণ্ডে তাঁরা অধিপতি। কোন আইন কানুন তাঁরা মানেন না। একজন আরেকজনের সম্পত্তির ওপর বাড়িয়ে আছে চিতাবাঘের থাবা। দরবারে দরবারে কান পাতলে শোনা যাবে ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের ফিসফাস।

এই ষড়যন্ত্রে হয়তো জড়িয়ে পড়েন কোন হতভাগ্য সামন্ত প্রভু ডিউক। পরিণতি দাঁড়ায় মৃত্যু বা নির্বাসন। নিহত হলে ভাল, ভাবনা যাবে না তো! কিন্তু নির্বাসন হলে কোথায় স্থান হয় তাদের ?

শ্যামলিমার স্নিগ্ধছায়ায়, মধ্যযুগের আয়নাকে, যেখানে জীবন অবাধ স্বাধীন। কখনো আবার এখানেই চোখে পড়ে দুর্দান্ত যোদ্ধাদের। সম্রাট বা ডিউকের অত্যাচারে তাদের দিয়েছে নির্বাসন।

তাঁরা চান প্রতিকার। প্রতিশোধ। দাঁড়ান বিদ্রোহী হয়ে, অবহেলিত, বঞ্চিত, মানবাত্মাকে বুকে নিয়ে। এই মধ্যযুগেও তাই রবীনহুডদের দেখা মেলে ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড সর্বত্রে।

রোল্যাণ্ড ডা বয়, এই রকমই এক মধ্যযুগীয় সামন্ত রাজ্যের সামন্ত প্রভু।

তিনি ছিলেন তাঁর রাজ্যের সবার প্রিয় মানুষ। বীরত্বের খ্যাতির সঙ্গে মিশেছিল কূটরাজনীতিজ্ঞ হিসেবে তাঁর নাম।

তাঁর মৃত্যুর পর, বড় ছেলে অলিভার হলো জমিদার।

ছোট অর্ল্যাণ্ডো হলো সম্পত্তি বঞ্চিত তুচ্ছ মানুষ। তাঁর জীবন বড় কষ্টের।

জমিদার অলিভারের ঘর সংলগ্ন বাগিচা। সেই বাগিচায় অর্ল্যাণ্ডো ও তাদের পুরানো চাকর। চিন্তা অর্ল্যাণ্ডোকে উত্তেজিত করেছে।

সে বলে, আর সইতে পারছি না ম্যাডাম। উইলে বাবা আমাকে দিয়ে গেছেন মাত্র এক হাজার মুদ্রা। অলিভারকে বলে গেছেন, আমাকে লেখা পড়া শেখাতে। কিন্তু তা শোনেনি অলিভার। আমার ভাই জেকস্‌কে সে পাঠলো বিশ্ববিদ্যালয়ে। অথচ আমাকে কেমন মূর্খ করে বসিয়ে রেখেছে বাড়ীতে। এই কি ভদ্রলোকের শিক্ষা?

আমার চেয়েও বরং ভাল আছে ওর ঘোড়াগুলো, শিক্ষাও পাচ্ছে ভাল, আর আমি? খাই দাই, চাকরবাকরদের সঙ্গে আছি। ভাইয়ের মর্যাদা পেলাম না। হারিয়েছি ভাইয়ের অধিকার। বড় দুঃখ ম্যাডাম, শরীরেই কেবল বেড়েছি, আর কি কোন উন্নতি হয়েছে আমার? শিক্ষা দূরে থাক, প্রকৃতির দান থেকেও সে আমাকে বঞ্চিত করেছে। সে দেয়নি ভাইয়ের মর্যাদা।

কিন্তু আমারও শরীরে বইছে বাবার রক্ত। আর সইবো না। দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙ্গে তাই এবার হবো মহা বিদ্রোহী। কিন্তু কি ভাবে? কি পথে ভাঙ্গতে হয় এই দাসত্ব-শৃঙ্খল?

নাঃ, তা তো জানি না ম্যাডাম। অর্ল্যাণ্ডোর দীর্ঘশ্বাসে স্পষ্ট হয় অজ্ঞানতা। সত্যি, কোনও কি পথ নেই? দাসত্বের এই ঘেরাটোপই কি তার অমোঘ ভবিষ্যৎ গ্রাস করে থাকবে? এই নিয়তি থেকে মুক্তি কোথায়?

হতাশা আচ্ছন্ন করলো তাকে। উত্তেজনা হলো তীব্র থেকে

তীব্রতর। তুষের মত ধিক ধিক রাগের আগুন হয়তো বাতাস পেলে জ্বলে উঠতো আরো। কিন্তু তার আগেই অলিভারের আসার সংবাদ দিল য়্যাডাম।

এ খবরে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল, ছড়িয়ে পড়ল রাগের আগুন।

সে বললো, আড়ালে সরে যাও তুমি য়্যাডাম। এখানেই শুনতে পাবে ও কি বলে, কিভাবে উত্তেজিত করে আমাকে।

য়্যাডাম গেল আড়ালে, অর্ল্যাণ্ডো পায়চারি করছে। অলিভার ঢুকলো।

অর্ল্যাণ্ডোর মতই সুঠাম দেহের সুন্দর যুবা সে। অর্ল্যাণ্ডোর মত তার মুখে নেই কোমলতা। বরং সেখানে ফুটেছে নিঠুর ক্রুরতা। অপরূপ ঈশ্বরের মত বীর্যদীপ্ত অর্ল্যাণ্ডো। আর অলিভার? ভাস্করতা শূন্য মলিন। পাপ তার সাবলীলতা চুরি করেছে। চোখ আর ভুরুতে ছায়া ফেলেছে কুটিলতার। মুখেও খারাপ ভাবনার আঁকিবুকি।

ভাই ভাই হলেও, মুখোমুখি হতেই শুরু হল ঝগড়া। ভাইকে দেখেই অলিভার বললো—তুমি? কি করছ এখানে?

—কিছু শিখেছি যে করবো। অর্ল্যাণ্ডোর উত্তর।

—তাতে ক্ষতি কি?

—না, ক্ষতি না, 'ভগবান যা দিল, তাও গেলে কুঁড়েমিতে।'

—কুঁড়েমি না করলেই হয়। কাজ করো।

—কি করবো? তোমার শূয়োরের পাল চরাবো? তাদের খুঁদকুঁড়ো খাব?—রেগে যায় অর্ল্যাণ্ডো। বাবার কত টাকা উড়েয়েছি যে এই হাল হল আমার?

অলিভারেরও রাগ চড়ে যায়। বলে—কার সামনে কথা বলছো জানো?

—জানি, বড় ভাইয়ের সামনে। যাকে বড় ভাই বলে অস্বীকার

করি না। কিন্তু আমিও একই বাবা-মা'র সন্তান। বড় ভাই বলে যে নিয়মে তুমি হতে পারো বাপের সব সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। সেই নিয়মেই আমার রক্তের অধিকার তো কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না। আমাদের মাঝে ভাই এলেও না। বাবার রক্ত যতটুকু পেয়েছ তুমি, আমিও পেয়েছি ঠিক ততটুকুই।

—মানে? চেঁচিয়ে ওঠে অলিভার।

—মানে জানো না তুমি? অর্ল্যাণ্ডোর চোখা প্রশ্ন।

—কি করবি তুই?

—তোমার বদলে অন্য কেউ আমার ভাই হলে কি করতাম, তা তুমিও জান।

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। অর্ল্যাণ্ডোকে আঘাত দেয় অলিভার। অর্ল্যাণ্ডোও মুহূর্তে প্রস্তুত। ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরী। কিন্তু তাতে মোটেই ভয় পেল না অলিভার। সে তাকে জন্ম তুলে খারাপ গালাগাল দিয়ে বসল। চকিতে কি ঘটে গেল। ক্রুদ্ধ অর্ল্যাণ্ডো ঝাঁপিয়ে পড়লো প্রবল আক্রোশে। চেপে ধরলো তাঁর টুঁটি। য়্যাডাম ছিল আড়ালে সে দৌড়ে এসে ছাড়িয়ে দিল লড়াই। ছাড়া পেয়ে গেল অলিভার।

অর্ল্যাণ্ডো কিন্তু সহজে ছাড়ার পাত্র নয়। সে বললো—তোমাকে ছাড়বো না। আর সহ্য করবো না তোমার অন্যায় স্বেচ্ছাচার। বাবার বিপুল শক্তি আমার ভিতর উৎসারিত। শোনো, বাবা যা দিয়েছে আমাকে তাই নিয়েই কপাল ফেরাতে চলে যাবো।

অলিভারের ঠোঁটে ব্যঙ্গ—তারপর টাকাগুলো ফুঁকে কি করবে তুমি? ভিক্ষে? বেশ তুমি বাবার উইলসম্মত ভাবে তোমার ভাগ পাবে। তাই নিয়ে তারপর জাহান্নামে যাও। আমি দেখতে যাবো না।

—ভালই হবে। আমিও জ্বালাতে আসবো না।

এবার অলিভারের চোখ পড়ল য়্যাডামের দিকে। বললে—

ধাড়ী কুকুর, তুইও দূর হয়ে যাবি ওর সঙ্গে।

য়্যাডাম হল বিশ্বস্ত চাকর। বড় দুঃখ পেল সে।

বললো—ধাড়ী কুকুর—এই এতদিনের বখশিস হল কর্তাবাবু? হাঁ হ্যাঁ, সত্যি তো, তোমাদের সেবায় সব কটা দাঁত আমার গেছে। ওহো ঠাকুর, তুমি আমাদের বুড়ো কর্তাবাবুকে শান্তিতে রেখো। আজ তুমি যা বললে, উনি কখখনো তা বলতে পারতেন না। য়্যাডামের সঙ্গে চলে গেল অর্ল্যাণ্ডো।

অপমানে, রাগে, উত্তেজনায় পায়চারি করতে করতে অলিভার বললো—চোপ! আমার ওপর তোমার মতামত চাপিয়ে দিতে চেয়ো না। তোকে আমি উচিৎ শিক্ষা দেবো। ঐ হাজার টাকা তোকে কিছুতেই দেবো না। কখখোনো না।

এসময়ে পরিচারক এসে জানায়, বিখ্যাত পালোয়ান চার্লস অলিভারের ডাকে এসেছে ডিউকের দরবারে। অলিভার চার্লসকে আসতে বললে চার্লস আসে। একদম পালোয়ানী শরীর। ঘাড়ে গর্দানে এক। মুখে ছড়ানো অহঙ্কার।

অলিভার জানতে চাইল ডিউকের দরবারী খবর।

সে জানালো—কিচ্ছু নেই, সবই পুরানো তুচ্ছ খবর। দাদা বুড়ো ডিউককে হাটিয়ে ছোট ভাই হয়েছে এখন নতুন ডিউক। বুড়ো ডিউক এদিকে দু'চারজন সদস্য নিয়ে উধাও।

অলিভার প্রশ্ন করে—আর, ডিউকের মেয়ে রোসালিণ্ড সেও কি······

—না না, ডিউকের মেয়ে রাজবাড়ীতেই আছেন।

—কাকা, মানে নয়া ডিউকও তাকে ভালবাসেন।

—কিন্তু, বুড়ো ডিউক চ্যালা ছুটিয়ে গেল কোথায়?

—আর কোথায়? তিনি এখন, লোকে বলে, আর্ডেনের অরণ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ইংল্যাণ্ডের বীর নায়ক রবীনহুডের মতই।

আর বড় বড় অভিজাত বংশের ছেলে ছোকরা তার আশে পাশে ঘুর ঘুর করছে। গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছেন আর কি। অনেকটা রূপকথার রাজ্যের মতই—যেখানে উপচে পড়তো পৃথিবীর যাবতীয় সুখ শান্তি। ধনদৌলত।

হঠাৎ চার্লসের কথায় ইতি টেনে অলিভার বললো—তুমি নাকি বলেছ ডিউকের সামনে খেলা দেখাবে?

—হ্যাঁ, কর্তাবাবু। তাইতো আপনার কাছে এলাম। শুনছি অর্ল্যাণ্ডো, আপনার ছোট ভাই ছদ্মবেশে আমার সঙ্গে যুদ্ধে নামবে। কাল আমার ইজ্জতের লড়াই। কেউ যদি তার হাড়গোড় না ভেঙে ফিরে যায় কাল, তো জানবেন, সে তার কপাল। ভাইটি আপনার ছোকরা। নরম মানুষ। ইজ্জতের জন্য তার ওপর কসরৎ দেখাতে রাজী নই আমি। তাই বলতে এলাম ওঁকে থামান। ওঁকে কিছুতেই যেতে দেবেন না, কর্তা।

এই কথা শুনে অলিভার তো বেজায় খুশী। সে চায় এক্ষুনি তার অপমানের বদলা নিতে। চায় তার প্রাপ্য সম্পদ গ্রাস করতে।

তথাপি সে মনের ইচ্ছা চেপে রেখে বলে, ধন্যবাদ, চার্লস। তুমি ভালবাসো আমায়। তাই বলতে এলে। আমার ভাইটি কিন্তু দারুণ একরোখা। এই ফ্রান্সের সবচেয়ে জেদী মানুষ। আমার বারণ সে শুনবে না। তার মনে ভীষণ উচ্চাকাঙ্ক্ষা। কারো ভাল পছন্দ করে না। আমাকে সে ঈর্ষা করে। তাই বলছি, তুমি ওকে যা খুশী করতে পার। খুব ভাল হয় যদি তুমি ওর আঙ্গুলের বদলে ওর ঘাড়টাকেই মটকে দাও।

এত নীচ ও, এতবড় শয়তান—ওর চরিত্রের কথা বলতে গেলে তো আমারই লজ্জা জন্মাবে। বিস্ময়ে থ' বনে যাবে তুমি। ওর কীর্তি তোমাকে পাথর করে ছাড়বে।

চার্লস শক্তিতেই বড়। বুদ্ধিতে নয়। সহজে সে উত্তেজিত হয়ে

উঠল। তার গোপন ফন্দি টের পেল না।

বললো—ঐ ছোকরাকে বাগে পেলে একবার দেখে নেবো। ব্যাটা চোট না খেয়ে ফিরে গেলে আমি ছেড়েই দেবো কুস্তি।

চলে গেল চার্লস।

খুশীতে টগবগ করে অলিভার, কাজ হাসিল। চার্লসকে সে ক্রুদ্ধ করে দিয়েছে—ফলে আর সুস্থ শরীরে ফিরবে না অর্ল্যাণ্ডো।

লড়াই শেষে পড়ে থাকবে তার নিস্তেজ শরীর। ভাই-এর ওপর গোপন হিংসা স্পষ্ট হয়। টের পায় কী অসীম ঘৃণা জমেছে অর্ল্যাণ্ডোকে ঘিরে। কিন্তু কেন? কেন? ধীরে ধীরে সে কারণ মুখী হতে চায়, পারে না।

অর্ল্যাণ্ডো কত বিনয়ী, নম্র, কত সরল ওর মন। বিদ্যালয়ের কড়িকাঠে পা না রেখেও সে শিক্ষিত। সবার প্রিয়, এমন কি প্রজারাও ভালবাসে তাকে। নিজেকে অর্ল্যাণ্ডোর পাশে তুলনা করতে গিয়ে সে দেখল, নিজেকে কেমন হীন অতি তুচ্ছ, মনে হয়। যাক গে, কাল তার মৃত্যু দিবস, অলিভারকে এক দহন থেকে মুক্তি দেবে চার্লস। তবে হ্যাঁ, অর্ল্যাণ্ডোর মধ্যেও ছড়িয়ে দিতে হবে উত্তেজনার সেঁকো বিষ।

ভাবতে ভাবতে অন্তরালে অদৃশ্য হল অলিভার।

দুই

ডিউকের প্রাসাদ অঙ্গন।

সামনে অনুপম সৌন্দর্যে ঢলঢল দুই কিশোরী।

দুইজনের মাঝে বয়সের ফারাক বড় অল্প। ওরা পরস্পরের অন্তরঙ্গ সাথী। রোসালিণ্ড বড়। তার বিষণ্ণ সুন্দর মুখে কাঁপছে মেঘমেদুর ছায়া। পিতার নির্বাসন কি আত্মজার মুখে ফেলেছে এই

বিষণ্ণতার ছাপ? সিলিয়া বয়সে ছোট। সাথীর মুখে হাসি ফোটাতে চায় সে। বলে—হাসি-খুশী থাকতে চেষ্টা কর না ভাই!

—বেশ হাসি-খুশীই তো আছি। বিষণ্ণ রোসালিণ্ড বলে, আর কি চাই? আমার উধাও বাবাকে যদি ভুলে যেতে না বলো তাহলে এর চেয়ে আমাকে বেশী আনন্দিত দেখবে না। বাপ যার নির্ব্বাসনে তার মুখে কি করে হাসি ফোটে বল?

বড় অভিমান হল সিলিয়ার।

দুঃখিত স্বরে বললো—যতখানি তোমাকে আমি ভালবাসি, ততখানি তুমি আমায় ভালবাস না। তোমার মত দশা হলে, তোমার বাবা আমার বাবাকে নির্বাসন দিলে, আমি তোমার বাবাকে নিজের বাবার মত মনে করতাম। এর জন্য দরকার গভীর ভালবাসা। তাই বলছি, তোমাকে আমি যতখানি ভালবাসি, তুমি আমায় ততখানি ভালবাস না।

—ঠিক আছে, রোসালিণ্ড জানায়, নিজের কথা ভুলে এবার আমি তোমার আনন্দ নিয়েই হব আনন্দিতা।

সিলিয়া বললো—দ্যাখো আমার বাবার ছেলে নেই। সন্তানও আর হবে না। তিনি চলে গেলে, উত্তরাধিকারী হবে তুমি। তোমার বাবাকে তিনি সবকিছু থেকে বঞ্চিত করেছেন, আমি তো ভালবেসে ফিরিয়ে দেবো তোমায়। অঙ্গীকার রইল। যদি ভাঙ্গি এ অঙ্গীকার যেন ডাইনা হই আমি। মিষ্টি রোসা সাথী, তোর দোহাই, একবার হাস না।

—ভাল, আমি হাসবো। এবার থেকে খুঁজে নেবো নতুন নতুন প্রমোদ। রোসালিণ্ড বললো, আচ্ছা বলতো কোন খেলায় আমরা হতে পারি আত্মহারা?

সিলিয়া বললো—আয়না, নিয়তির গিন্নি-বান্নী ঐ দেবীকে নিয়ে বেশ মজা করি আমরা। উনি চাকায় চড়লে, ভাগ্য ঘোরে, চাকাও ঘোরে। ঐ দেবীকে এমন ইয়ার্কি করব যে উনি রথ ছেড়ে পালাবেন।

তখন দেখবে আমাদের সবার কপালে একই ভাগ্যরেখা।

—আহ, যদি পারতাম। যোগ্যহীন মানুষই পায় যে ওঁর করুণা। রোসালিণ্ড বলে—যদিও দানের হাতটি দরাজ, তবু দেবী অন্ধ, শুধু মেয়েদের বেলায়।

সিলিয়া বলে উঠল,—ঠিক, ঠিক, যাদের সুন্দর করে গড়েন শুভ-বুদ্ধি কখনো দেন না তাঁদের। আর যাদের দেন অমন মনের সৌরভ সৌন্দর্য থেকে তারা হয় বঞ্চিত।

রোসালিণ্ড জানায়,—তুমি যে হঠাৎ ভাগ্যের দেবী থেকে সটান প্রকৃতি ঠাকুরের কাছে চলে গেলে। অপার্থিব সুখ দুঃখের মালমশলা নিয়েই ভাগ্য ঠাকুর তাঁর কারবার ফেঁদেছেন আর প্রকৃতি ঠাকুর? তাঁর কাজ তো মানুষের শরীর গড়বার।

টাচ্‌ষ্টোনকে দেখা গেল এ সময়ে।

রাজারা খুব পছন্দ করেন এই সব বিদূষকদের। এছাড়া আনন্দ জমে না। এরা জমিদারের মন জুগিয়ে কথা বলে, হাসায় এবং হাসে। তবু ভাড়ামি আর চাটুবৃত্তিই এদের পেশা আর নেশা নয়।

পৃথিবীর যাবতীয় অভিজ্ঞতা এদের বুদ্ধিমান করেছে। এদের অভিজ্ঞতাপ্রসূত কথাবার্তা শুনে সব হাসে। ভাবে হাল্কা রসের 'ইয়ার্কি'। জানে না, কোথায় লুকিয়ে আছে গভীর জীবনবোধ। মুর্খরাই বোঝে না। রসিক ঠিক চিনে নেয় মানুষ।

টাচষ্টোনের পোষাক যাত্রা দলের কঞ্চুকীর মত।

ঢিলে জোব্বা। দাড়ি গোঁফ ভরা মুখ। চোঙার মত গোল টুপি মাথা ঢেকেছে।

তাকে দেখে সিলিয়া বলে ওঠে,—উহুঁ, ঠিক বুঝতে পারছো না, প্রকৃতি ঠাকুর, মনে কর, এক পরমা সুন্দরী নারী গড়লেন, কপাল খারাপ হলে যে কত কষ্টে পড়তে পারে, পুড়তে পারে আগুনে। ঐ দ্যাখো, আমাদের বুদ্ধি দিয়েছেন প্রকৃতি ঠাকুর, ভাগ্যকে নিয়ে

বিদ্রূপ করতে পারি—শুধু এ সময়েই ভাগ্য ঠাকুর কেন আমায় এক মূর্খ ভাঁড়কে পাঠিয়ে ভেস্তে দিলেন আমাদের গল্প-গুজব ?

হাসলো রোসালিণ্ড, সুতরাং প্রকৃতি দেবী ভাগ্যদেবীর চেয়ে ঢের বেশী ক্ষমতা রাখেন। ভাঁড়, ঐ যে, মূর্খতা যার স্বভাব, তাকে দিয়েই উনি উড়িয়ে দিতে চান প্রকৃতি দেবীর শ্রেষ্ঠ দান আমাদের এই বুদ্ধিকে।

—হয়তো ভাগ্যদেবীর ব্যাপার নয় এটা, সিলিয়া বললো—হয়তো প্রকৃতিদেবীরই কাজ। তিনি দেখলেন আমাদের বুদ্ধি কত ভোঁতা, তাই শান-পাথর করে পাঠিয়েছেন ওকে। নামে ওর পরশ পাথর। আসলে ওই হল শান পাথর।

—তা এই যে বুদ্ধু, কোথায় চলেছেন মশাই ?

টাচ্‌ষ্টোন জানায়, সিলিয়াকে তার বাবা ডেকে পাঠিয়েছেন।

—তাহলে আপনি দূত বলুন ?

—আরে না-না, টাচ্‌ষ্টোন বললো—নিজের সম্মানের দোহাই দিয়ে বলছি, আমি দূত ফুত নই। হুকুম করলে তাই এলাম।

—ওহে মূর্খ, অমন হলাও করা শিখলে কোত্থেকে ?

রোসালিণ্ড প্রশ্ন করতে যেন কথার তুবড়ি ছুটলো টাচ্‌ষ্টোনের : শিখেছি এক বীরের কাছে। নিজের সম্মানের দোহাই পেড়ে যিনি বলতেন তাঁর পিঠে ভাল আর খুব খারাপ রাই সরষের ঝাল। কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি, ওর রাই সরষের ঝালই খুব ভাল, পিঠেগুলিই বরং খারাপ। এতে কি আমাদের বীরের কথা মিথ্যে হয়ে গেল ?

সিলিয়া মুখিয়ে ওঠে—এই কথাটা আপনার সত্যি ? প্রমাণ চাই।

সায় দেয় রোসালিণ্ড—হ্যাঁ দেখানতো ?

—তাহলে আপনারা আমার সামনে বসে নিজেদের চিবুক ঘষে ঘষে দাড়ি ছুঁয়ে বলুন, আমি ঠক, প্রবঞ্চক, খারাপ লোক।

—এমা, মেয়েদের আবাব দাড়ি কি গো !

এভাবেই ওরা যখন গল্পে মশগুল তখনই লে বো নামের এক সভাসদ এসে জানায়, মল্লভূমিতে লড়াই শুরু হয়ে গেছে। চার্লসের হাতে তিন জন পরাস্ত। বাকী একজনের সঙ্গে এখনই শুরু হবে শেষ লড়াই।

রণ দামামা বাজে। ঢোকে ডিউক ফ্রেডরিকের সঙ্গে কিছু সভাসদ। চোখে পড়ে চার্লস ও অর্ল্যাণ্ডোকেও।

দুই বন্ধু দেখলো, বিশাল দেহের চার্লসের প্রতিপক্ষ সুন্দর মুখের এক ছোট্ট কিশোর। চকিতে শিউরে উঠলো ওরা। বোঝাই যায় এ যুদ্ধ অসম।

রোসালিণ্ডের চোখ অর্ল্যাণ্ডোর দিকে। বললো—উনি যোদ্ধা?

—উনিই যোদ্ধা। লে বো মাথা ঝাঁকায়।

সিলিয়া বলে—ইস্, বড় ছোকরা বয়েস। তবে ওঁর দৃষ্টিতে লেখা আছে এই যুদ্ধের সফলতা। ওঁকে একবার ডাকবেন?

লে বো ডাকলেন। এলো অর্ল্যাণ্ডো, রোসালিণ্ড বললো—লড়াই আপনি ডেকেছেন?

—না, অর্ল্যাণ্ডোর উত্তর, ঐ মল্লবীরই সবাইকে ডেকেছে। ওর ডাকে আর সবার মত আমিও এসেছি।

—আপনার সাহস বেশী, বয়স কম, আমাদের অনুরোধ, সিলিয়া বলে, এই অসম যুদ্ধে নামবেন না। দেখছেন তো অসুরটার বিক্রম।

রোসালিণ্ড জানায়—ডিউককে বলে বলে যুদ্ধ বন্ধ করে দিচ্ছি আমরা, তাহলে কাপুরুষতা স্পর্শ করবে না আপনাকে।

অর্ল্যাণ্ডো কিশোরীদের দিকে তাকালো—রাগ করবেন না, এত সুন্দর মুখের অনুরোধ রাখতে পাচ্ছি না। আপনাদের ঐ অসম চোখ আর শুভেচ্ছা এই যুদ্ধে আমার পাথেয় হয়ে রইল। হারি যদি হারবে সেই লোক, জীবনে যে কখনো ভলেবাসার মুখ দেখেনি। মরবে সেই মানুষ, মৃত্যু যার কাঙ্খিত। আমার মৃত্যু কাউকে দেবে

না বিন্দুমাত্র শোক। এতটুকু ক্ষতি হবে না পৃথিবীর। অথচ, যে জায়গাটুকু অধিকার করে আছি, সেটুকু পাবে কোন যোগ্য মানুষ।

অর্ল্যাণ্ডো বিদায় চাইল।

ঠিক তখনই ওদিকে, চেঁচিয়ে ওঠে চার্লস, কে আছ বীর, কে চাও মৃত্যু তিলক, কাছে এসো।

লড়াই শুরু হল।

সিলিয়ার ভয়, কিশোর নায়ক যেন আহত না হয়।

রোসালিণ্ডের স্বপ্ন ওকে ঘিরে থাকে।

ঐ বান্ধবহীন-মৃত্যুকামী প্রেমহীন-কিশোর, আহা, সে বুঝি আমারই মত। প্রতি মুহূর্তের বিপদ আশংকায় দুরু দুরু কাঁপে ভীরু কিশোরী হৃদয়।

ওদিকে যুদ্ধরত তরুনের বুকে কিশোরীর দৃষ্টি দিচ্ছে অপরিমেয় শক্তি।

এই শক্তি নিয়ে সে হল অপরাজেয়, পরাজিত করল তুচ্ছ চার্লসকে।

কিশোরের সাহস ও শক্তি খুশী করলো ডিউককে।

তিনি ওর নাম জিজ্ঞাসা করতে, অর্ল্যাণ্ডো জানালো, মৃত সামন্ত প্রভু রোলাণ্ডের ছোট ছেলে সে।

আজ রোলাণ্ড নেই।

কিন্তু একদিন ছিলেন নির্বাসিত ডিউকের ঘনিষ্ঠ মানুষ। তাই এই তরুণ বীরের ওপর ফ্রেডারকেব চোখ পড়ল আক্রোশ নিয়ে।

—হায়রে, অন্য কারো ছেলে হলে না কেন তুমি! বলেই দ্রুত চলে গেলেন। সঙ্গে গেল সভাসদগণও।

কিশোরীরা এল অর্ল্যাণ্ডোর কাছে। ক্ষমা চাইল নতুন ডিউকের খারাপ ব্যবহারের জন্যে।

গলার হার খুলে রোসালিণ্ড বললো—আমার কথা ভেবে পরবেন এই হার! ভাগ্য ভাল থাকলে আরো দিতে পারতাম। কিন্তু

আজ আমি অসহায় অক্ষম।

বিদায় জানিয়ে চলে গেল ওরা।

একা একা দাঁড়িয়ে অর্ল্যাণ্ডো কি ভাবছিল। সে তো ফিরে এল এমন সময়। বন্ধুর মত পরামর্শ দিল, বললো, ডিউক ক্রুদ্ধ। সে যেন এখান থেকে পালায়।

ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে জেনে নিল অর্ল্যাণ্ডো, রোসালিণ্ড নির্বাসিত ডিউকের মেয়ে। আর সিলিয়া? নতুন ডিউকের।

সে বো চলে গেছে কখন। অর্ল্যাণ্ডো ভাবছে, একদিকে কুচক্রী ভাই, অন্য দিকে নিষ্ঠুর ডিউক, মাঝে শুধু একবিন্দু সান্ত্বনার মত স্বর্গের দেবদূত, ঐ রোসালিণ্ড।

তিন

ডিউকের রাজপ্রাসাদের ঘর।

নিভৃতে আলাপচারী সিলিয়া ও রোসালিণ্ড। অর্ল্যাণ্ডো নেই। এক কুমারী মনে সে রেখে গেছে কালবৈশাখী ঝড়।

সিলিয়া বললো—একটা কথাও কি বলবি না সই? কার জন্যে এত ভাবনা তোর? বাবা? শুধু কি বাবা? রোসালিণ্ডের মুখে বাসি ফুলের মলিন হাসি। যে আমার স্বামী হবে, তার জন্যেও কিছুটা। ভাবনা তো আনন্দের যম।

সিলিয়া বললো—উড়িয়ে দে তাকে।

—শুধু কি ভাবনা? তার চেয়েও গভীর······

—হেঁয়ালী রাখ সই। ব্যাপারটা কি বলতো? রোলাণ্ডের ছোট ছেলেকে মনে ধরেছে বুঝি?

—আমার বাবা তো স্যার রোলাণ্ডকে ভালবাসতেন।

—তবে আর কি, তুমি তার ছেলেকে ভালবাস। আমার বাপ

তো তাকে ঘৃণা করতেন। সুতরাং আমিও তার ছেলেকে ঘৃণা করবো। কিন্তু আমি তো ঘৃণা করি না অর্ল্যাণ্ডোকে।

—না, ওকে ঘৃণা করতে পারবে না।

—কেন? ওকি ভালবাসার লোক?

এভাবেই ওরা যখন বিভোর তখনই ডিউক ঢোকে। সঙ্গে সহচরবৃন্দ। রাঙা চোখের ক্রুদ্ধ ডিউক ঢুকেই জানায়—রোসালিণ্ড তোমায় নির্বাসন দিলাম।

বিস্ময়ে রোসালিণ্ড চেয়ে রইল অপলক।

—হুম, তোমাকে বিশ মাইল দূরে যেতে হবে দশ দিনের ভেতর। রাজ্যের কাছে এলেই মৃত্যু হবে তোমার।

দৃঢ়কণ্ঠে রোসালিণ্ড বলে—আমার অপরাধ? সজ্ঞানে কখনো আপনার বিরুদ্ধাচরণ কি খারাপ চিন্তা করেছি কি? স্বপ্নের কথা আলাদা— বিশ্বাসঘাতকদের সেই একই কথা। রাগে চীৎকার করে ওঠে ডিউক, যেন সব নিষ্পাপ অবতার এক একটি। শোন, তোমাকে বিশ্বাস করি না আমি।

—আপনার অবিশ্বাস আছে বলেই কি আমি বিশ্বাসঘাতক? কি কারণে বিশ্বাসঘাতক হলাম সেটাই বলুন? রোসালিণ্ড আরো বলে—আমার বাবার রাজ্য যখন ছিনিয়ে নিলেন আপনি, তখন তো আমার বাবারই মেয়ে ছিলাম। তাঁকে নির্বাসন দিলেন যখন, তখন আমিও তাঁর মেয়ে। বিশ্বাসঘাতকতা কি উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায়?

...তাহলেও আমি অপরাধী নই। কেননা আমার বাবা বিশ্বাস-ঘাতক ছিলেন না।

—বাবা, সিলিয়ার কণ্ঠে মিনতি, ওকে নির্বাসন দেবেন না। ও বিশ্বাসঘাতক হলে আমিও বিশ্বাসঘাতক। আমরা তো অভিন্ন, এক, এখনো যে আমরা এক সঙ্গে শুই, বসি, খেলতে যাই।

গর্জে ওঠে ডিউক, তোমার জন্যেই ওকে রেখেছিলুম। না হলে

হবে ওর সঙ্গে পাঠাতুম নির্বাসনে।

সিলিয়া বলে ওঠে—ওকে নির্বাসন দিলে আমাকেও দিতে হবে।

—ওর কুটিলতার কাছে তুমি হেরে যাবে সিলিয়া। ডিউক মেয়ের মনে বুনে দিতে চায় সন্দেহের বীজ। ওর সহিষ্ণুতা ও নীরবতায় গলে যায় মানুষ। ও কেড়ে নিচ্ছে তোমার যশ। তাই ও চলে গেলে, তুমি লোকের চোখে ফের উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

—তবু আমাকে এ শাস্তি দিন বাবা।

—মূর্খ! মেয়েকে আর কিছু না বলে রোসালিণ্ডের দিকে ডিউক তাকিয়ে বলেন, তৈরী হয়ে নাও। আমার আদেশ নড়চড় হয় না।

ডিউক চলে গেলেন।

—কি করবে সই? কোথায় যাবে? সিলিয়া কেমন বিভ্রান্ত।

রোসালিণ্ড কেবল বললো—চলো যাবো।

—আমিও সঙ্গে যাবো। আমাকেও নির্বাসন দিয়েছেন বাবা।

—না। দেননি।

—দিয়েছেন। না-না, আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।

—কোথায়?

—কেন? আর্ডেনের বনে।

—কিন্তু সই, আমরা যে মেয়ে। যদি বিপদ আসে।

রোসালিণ্ড বললে—আমি লম্বায় বড়, সুতরাং আমি সাজবো পুরুষ। ধরবো হাতে বর্শা। বুকে থাকবে তোর মতই ভুরু ভুরু কুমারী ভাব। আমার বাইরেটা হবে তুরন্ত যোদ্ধার মত, ভেতরে থাকবে ভীরু পুরুষের কোমলতা, কেমন?

—কিন্তু পুরুষ হলে কি নামে ডাকবো তোমায়?

—নাম হবে গানিমেড। আর তুই। কি নাম হবে তোর?

—সিলিয়ায় বদলে আলিয়েনা। যেমন দশা তেমন নাম। আর হ্যাঁ, ঐ ভাঁড়টাকেও নিয়ে চল না। পথের ক্লান্তি দূর হবে আমাদের।

এসব ভাবনায় খুশী হয়ে উঠল সিলিয়াও। গেল গয়নাগাঁটি—টাকাকড়ি গুছিয়ে তৈরী হতে। মনে তাদের প্রশান্ত উল্লাস। এ যেন নির্বাসন নয়—যেন মুক্ত প্রকৃতির অধীর শ্যামলিমার ভিতর হারিয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা।

চার

আর্ডেনের অরণ্যানী।

এ অরণ্যের মাথায় ঝুঁকে থাকে বিশাল নীলিমা।

নীচে বিস্তৃত শ্যামলিমার কোলে মানুষ। সঙ্গী সাথী নিয়ে নির্বাসিত ডিউকও এখানের অধিবাসী। উদ্বেগ নেই।

দুশ্চিন্তা উধাও। নিলিম আকশের নীচে আনন্দে কাটাও দিন। বড় ভাল লাগে ডিউকের।

সঙ্গীদের বলেন—রাজদরবারের ঈর্ষা-দ্বেষ কুটিলতা এখানে নেই। তবু মানুষ যে কষ্ট ভোগ করে তাঁদের সেই কষ্ট এখানেও। মানুষের আদি পিতা আদম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে যে ভুল করেছিলেন, জন্ম দিয়েছিলেন পৃথিবীর সব দুঃখ কষ্ট, সে দুঃখ নেই এখানে।

ত্থাখো, এখানে শীতের হাওয়া আসে, বয়ে যায়, দংশনে বিক্ষত করে শরীর।

তবু কত আনন্দ। নিজের অবস্থার কথা মনে পড়ে অরণ্য শিক্ষা দেয় দারিদ্র শুধু অভিশাপ নয়। সে এক বিষাক্ত সাপ—ভয়ঙ্কর—তার মাথায় মানিক। আমি সন্ধান পেয়েছি সে রত্নের।

বর পেয়েছি দারিদ্র্যের। শিক্ষা পেয়েছি বৃক্ষ ও নদী, পাথর ও আকাশ থেকে। সবকিছু ভাল, বড় ভাল লাগে।

জীবন এখানে মন্থর। এই মন্থরতা বদলাতে চান না ডিউক ও তাঁর সঙ্গীরা।

এ সব শুনে সাথীদের মধ্যে আনিয়েনস্ বলে—আপনি ধন্য ডিউক, আমি সুখী। ভাগ্যের পরিহাসে এভাবেই আপনি মানিয়ে নিচ্ছেন। এ ভাবেই বার থেকে নিঙড়ে নিচ্ছেন শিক্ষা।

কেবল উপদেশ নয়, এই অরণ্য জীবনের উল্লাস ডিউককে শিকারী করেছে, খেলুড়ে করেছে আবার আদিবাসী পশুদের জন্য তাঁকে করেছে ব্যথিত। তাই হরিণ শিকারে তিনি হন বিষণ্ণ।

তাঁরই ব্যথিত চিত্তের সঙ্গী ছিল জেক্স। সেও তাঁর সহচর। তাঁর মতই বিষণ্ণ।

এ সময়ে ডিউক সাথীদের সঙ্গে মৃগয়ায় যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আবার পরক্ষণেই অরণ্যবাসী পশুদের ওপর তাঁর মমতা উথলে ওঠে।

তিনি বলেন—ওরা থাক ওদের নিভৃত বনচ্ছায়ে। দূর থেকে তীর ছুঁড়ে কেন রক্তাক্ত করবো ওদের ?

বিষণ্ণ জেক্সও নাকি ওই কথা বললেন। এক সভাসদ জানান, জেক্স্ বলে অত্যাচারী ডিউকের চেয়ে নির্বাসিত ডিউক কম নিষ্ঠুর নন। একদা সে এক বুড়ো ওক গাছের নিচে শুয়েছিল, হঠাৎ শরবিদ্ধ এক হরিণ সেই গাছের নিচে লুটিয়ে পড়ল। তার চোখের জল মিশল নদীর স্রোতে।

জেক্সের মনে হল, যার বিস্তর থাকে, মানুষ তাকেই দেয় বেশী। হরিণও তাই পূর্ণ নদীর জল বাড়িয়ে দিল ক'ফোঁটা কান্নায়।

জেক্স আরো বললো—এই রকমই নিয়তির বিচার। দুর্ভাগ্য সঙ্গে আনে বন্ধু-বিচ্ছেদ। জেক্স যখন এইসব ভাবে বিভোর, তখনই তার পাশ দিয়ে চলে যায় একদল হরিণ। সে ওদের দেখে বললো—তোমরা ফিরেও তাকাও না বন্ধুর দিকে। যাও, চলে যাও অকৃতজ্ঞের দল, তোমারা সমৃদ্ধে উজ্জ্বল। কেন বন্ধুর দিকে তাকাবে ? কেন জানাবে সমবেদনা ?

জেক্সের মুখে বিদ্রূপের ঝিলিক। দেশ-রাজ্য-নগর জীবন

নিয়েই চলে তার দর্শন তত্ত্ব।

বলে—আমরা জঘন্য দস্যু, পশুদের হত্যা করছি তাদেরই বাসভূমে। ডিউক বলে—তারপর ? ওখানেই রেখে এলে তাকে ?

—হ্যাঁ। সভাসদ জানায়। সে তখন কাঁদছে। দর্শন কপচাচ্ছে।

—নিয়ে চল আমাকে। ডিউক জানায়। ও বিষণ্ণ হলে দর্শনের কথা বলে, তখন ওকে দেখতে ভাল লাগে আমার।

তখন জেক্‌সকে আসতে দেখে চলে যায় সভাসদ।

পাঁচ

ডিউকের প্রাসাদ।

রোসালিণ্ড ও সিলিয়ার চলে যাওয়ায় তিনি উত্তেজিত। ভাবছেন, কারো অভিসন্ধি আছে এর পিছনে। সত্যি এ অসম্ভব! দারুণ অসম্ভব। কেউ সাহায্য করেছে নিশ্চয়ই।

এক সভাসদ বলেন—কেউ জানে না কখন গেছেন রাজকুমারী। পরিচারিকা দেখেছে, রাত্রে তিনি শয্যায়। সকালে নেই।

আরেক জন বলেন—ঐ ভাঁড়, আপনাকে যে হাসাতো, খুশি রাখত, সেও গেছে।

রাজকুমারীর প্রিয় সহচরী হিস্‌ পাসিয়া শুনেছে ওরা প্রশংসা করছিলেন ঐ কিশোর যোদ্ধার। তার মতে, নির্ঘাত ওদের সঙ্গে আছে ওই কিশোর!

ডিউকের আদেশ হল—ঐ কিশোরের ভাইকে ডেকে আন, যদি না পাওয়া যায়, ওর ভাইকে নিয়ে এস। আমি তাকে টোপ ফেলেই ওকে ধরবো। তাড়াতাড়ি যাও, ফিরে না আসা পর্যন্ত কারো মুক্তি নেই।

এই আদেশে সৈন্য ছুটলো দিকবিদিকে। পলাতকা কিশোরীদ্বয়ের

জন্য ডিউক উদগ্রীব। ওদিকে সিলিয়া আর রোসালিণ্ড তো আর্ডেনের বনে। অর্ল্যাণ্ডোও কি সঙ্গী হল তাদের?

ছয়

বিজয়ী অর্ল্যাণ্ডো ফিরছিল ঘরের পথে।

দরজার সামনে দেখল, য়্যাডাম।

সে আঁতকে উঠে বললো—ছোট কর্ত্তা না? এখানে এলে কেন গো, কেন সৎ হলে, কেন মানুষ ভালবাসে তোমাকে, কর্ত্তা গো, কেন ফিরে এলে বিজয়ী হয়ে? অনেক মানুষের কাছে তাদের গুণই যে তাদের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। আহা ছোটকর্ত্তা, তোমারও সেই দশা।

—কি হয়েছে য়্যাডাম? অর্ল্যাণ্ডোর বিস্মিত স্বর!

—খবরদার বাড়ীতে ঢুকো না! এক বাপের হয়েও তোমার ভাই তোমার শত্রু। তুমি ঘরে ঢুকলে, সে আজ রাতে আগুন ধরিয়ে দেবে। তাতেও মরণ না হলে, কেটে ফেলবে টুকরো টুকরো করে।

—কিন্তু কোথায় যাব আমি?

—যেখানে হোক, এখান থেকে দূরে।

অর্ল্যাণ্ডো ডুবে গেল হতাশায়। আপন বাড়ীর অধিকার হারালো সে। আর স্থান হবে না এখানে। তাহলে জীবন চলবে কোন পথে। ভিক্ষুক হবো? কিংবা দস্যু? চকিতে তরবারি হানবো নিরপরাধ পথিকের মাথায়?

না-না, যা হয় হোক, বাড়ীই আমার ভাল। এখানে না হয় স্বীকার করে নেবো ভাইয়ের অত্যাচার।

এই নাও পাঁচশো টাকা। সঙ্গী নাও তোমার এই বুড়ো চাকর য়্যাডামকে। চলো, অর্ল্যাণ্ডো মনে মনে বললো, হায় বৃদ্ধ, কি প্রতিদান পাবে তুমি? কিছু না। তথাপি ঘুরবো একসঙ্গে।

সঞ্চয় শেষে কোথাও বাঁধবো শান্তির নীড়। হয়তো সুখী হবো। মুখে বললো, চল, ঢের দেরী হয়ে গেছে।

সাত

আর্ডেনের বনে তিন পথিক।

এক অপরূপ তরুণ, এক তরুণী ও সঙ্গী তাদের এক বৃদ্ধ। কাছে আসতে চেনা গেল বৃদ্ধকে। এই ডিউক-প্রাসাদের বিদূষক টাচস্টোন।

তবে কি ঐ তরুণ ছদ্মবেশী রোসালিণ্ড ?

ঐ মেয়েটি সিলিয়া ?

চুপ, এখন ওরা নাম বদলে দুই ভাই-বোন, গানিমেড ও আলিয়ানা।

বহুপথ ভেঙে আর্ডেনে এসেছে ওরা ঘর বাঁধবে বলে। পেশা ওদের মেষপালক।

—চলতে পাচ্ছি না. উফ্! সিলিয়া শ্রান্ত। বলে—আর তো বইতে পারি না শরীর।

সঙ্গে সঙ্গেই টাচস্টোন বলে ওঠে—যদি আমার কথা বলেন, বলবো—সইতে পারি আপনাকে, বইতে পারবো না। যদি বইতেই হয়, তাতেও লাভ নেই। কেননা, আপনার টাকার থলি তো শূন্য।

পথশ্রমেও ক্লান্ত নয় বিদূষক। এখনো সজীবতা তাকে ঘিরে।

রোসালিণ্ড বললো—ঐ দেখুন কারা আসছে।

এক বৃদ্ধ আর এক সুপুরুষ যুবা গভীর আলাপে মগ্ন।

ওরা কাছে এল। ওরা মেষ-পালক।

যুবকটি সিলভিয়াস। বৃদ্ধ হল করিণ। বৃদ্ধের কাছে যুবক শোনাচ্ছে তার ভালবাসার খেয়ালীপনা, ওরা গল্পে এত মশগুল,

কাউকে দেখতে পেল না। চলে গেল উদভ্রান্তের মত। রোসালিণ্ডের কানে এল ওদের টুকরো টুকরো কথা। সে বললো—হায়রে মেষ পালক। তোমার বুকের ক্ষতে টের পেলাম আমার বেদনা।

ওদিকে সিলিয়া খিদেয় অস্থির। পিপাসায় কাতর, বললো—ঐ বুড়োকে জিজ্ঞেস করো যদি কিছু খাবার পাওয়া যায়। নইলে নির্ঘাত মারা পড়ব। টাচষ্টোন ওদের ডাকলো।

ক্ষুধা পিপাসায় মূর্ছিত সিলিয়ার দিকে চেয়ে করিণ বললে—দুঃখ হচ্ছে আপনার সঙ্গিনীর জন্য, আমার মনিব জানেন, রুক্ষ স্বভাবের বড় কৃপণ মানুষ। সব বেচে দিচ্ছে সে। সে এখানে নেই, তবুও আসুন, কিছু পেতে চেষ্টা করা যাক।

রোসালিণ্ড জানায়—তোমার মনিবের সব কিছু কিনে নেবো আমরা। তোমাকে সঙ্গে নেবো। সিলিয়া আশ্বাস দেয়, ভাল মাইনে পাবে। ওরা এগিয়ে চললো, সঙ্গে করিণ।

আট

আর্ডেনের ঘন অরণ্য।

খাবার প্রস্তুত।

দেখা যায় আনিয়েনস জেক্‌স আর নির্বাসিত সঙ্গী সাথীদের। নির্বাসিত ডিউককে দেখা যায় না। আনিয়েনসের গলায় গান—এইখানে বনে বনান্তরে, এই বৃক্ষ ছায়ায় অলসভাবে শুয়ে কে চাও দিন কাটবে আমার সাথে চাও যদি চলে এসো, কুজনে কুজনে পাখীর গুঞ্জনে তোমার সুর দাও মিলিয়ে, চাও যদি চলে এসো এই গানে—

শত্রু উধাও, এখানে আছে শুধু শীত, কিছু ঝড়।

জেক্‌স ওকে উৎসাহিত করে—গেয়ে যাও আনিয়েনস, গাও—

—কিন্তু গান, সে তো আমাকে দহন দেয় জ্যাক।

—তাই তো চাই, গান থেকে নিঙড়ে নেবো ব্যথা। গাও—

—আমার স্বর বেসুরো—আনিয়েনসের গলা।

—তবু গাও, জেক্‌স বলে, আনন্দ নয়, ব্যথা চাই।

—বেশ গাইছি। খাবার সাজান আপনারা।

—আসছেন তিনি, তোমাকে জেক্‌স্ সারাদিন খুঁজেছেন।

জেক্‌স জানায়—ওরে তর্ক আমার ভালো লাগে না। আমার বুদ্ধি নিয়ে আমি বড়াই করতে চাই না। যাকগে তুমি গাও। ফের গান শুরু হয়—

যার চোখে স্বপ্ন উধাও।
সে জীবন হোক অরণ্যের গহনে স্বাধীনতা
শ্রম দিয়ে কিনে নেয় খাদ্যের প্রশস্ত ভাঁড়ার
সে, সে, শুধু সেই এসো এখানে
এই শীত, ঝড় ভরা আর্ডেনের বৃক্ষছায়ে।

* * *

জেক্‌স বলে, এবার আমি গান গাই? আমার কবিত্ব নেই. তবু এটা আমারই রচনা—

ধন দৌলত আর যদি সুখের জীবন ছাড়ে কেউ স্বেচ্ছায়
মূর্খের মত এখানে এলে, দেখা পাবে কত মূর্খের
অন্ততঃ এলে আমার কাছে, আমি দেখিয়ে দেবো তাকে।

* * *

এখনো ডিউক নিপাত্তা। গান স্তব্ধ। আনিয়েনস ছুটলো ডিউকের উদ্দেশ্যে।

নয়

শান্তির নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের খোঁজ।

আর্ডেনের বনে এসেছে য়্যাডাম ও অর্ল্যাণ্ডো। য়্যাডাম পথশ্রমে ক্লান্ত। ক্ষুধার্ত। মুমূর্ষ। সে লুটিয়ে পড়েছে বনের মধ্যে।

শুয়ে শুয়েই বলল—য়্যাডাম, কর্তাগো, এখানেই কবর হোক আমার। তুমি যাও।

তথাপি অর্ল্যাণ্ডো আশ্বাস দেয়, এ বনে কোথাও খাবার পেলে আনবো। মৃত্যুকে আরেকটু ঠেকিয়ে রাখো, এখুনি আসছি। শূন্য হাতে যদি ফিরি, মৃত্যু দেবো তোমায়। আর, আমার আসার আগেই তুমি মরলে, ব্যর্থ হবে আমার সব পরিশ্রম। আরেকটু বেঁচে থাক বন্ধু, একটুক্ষণ, আমি আসছি।

য়্যাডামকে ওক গাছের নিচে রেখে চলে গেল অর্ল্যাণ্ডো।

দশ

খোলা আকাশের নিচে সামান্য ফলমূল সজ্জিত টেবিল।

সভাসদরা অপেক্ষারত, নির্বাসিত ডিউক এলে শুরু হবে ভোজ। ডিউককে আসতে দেখা যায় এ সময়। সঙ্গে আমিয়েনস।

ডিউক জেক্সকে দেখতে না পেয়ে প্রশ্ন করেন—সে কোথায়? একটু আগে ছুটে চলে গেল। এক সভাসদ জানায়, গান তাকে পাগল করেছে।

ডিউক যখন তাদের খোঁজের জন্য পাঠাবেন, ঠিক তখনই আসে জেক্স। বলে—বনের মধ্যে রঙচঙে পোষাক পরা বোকা, পেশাদার এক ভাঁড়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাকে সুপ্রভাত জানাতেই,

সে পকেট থেকে বার করলো এক ঘড়ি। বললো—দেখুন এখন দশটা। এক ঘণ্টা আগে ছিল নটা, একঘণ্টা কাটলে হবে এগারটা। এমনি করেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুড়ো হব, নষ্ট হব। এই নিয়ে তার নীতি কথা শোনালো। আমি তো হেসেই খুন। বাব্বাঃ মূর্খ ভাঁড় এতো জ্ঞানী হয় ?

—কেমন ভাঁড় ও ? জানতে চান ডিউক।

—চমৎকার। এককালে রাজদরবারে ছিল। মচমচে বিস্কুট বোঝাই জাহাজের মত মগজ ভর্তি উদ্ভট কল্পনা। হঠাৎ হঠাৎ সেগুলো আগোছালে বেরিয়ে আসে, আহ্, আমি কেন বোকা হলাম না ? ঐরকম পোশাকে নিজেকে সাজতে বড় সাধ আমার। দেবেন আমাকে ?

ডিউক বলে—দেব।

—শুধু একটি শর্ত, ভুলে যেতে হবে আপনাকে যে আমি জ্ঞানী। স্বাধীনতা পাব অবাধ বলার। বিদ্রূপ নির্মম আঘাত হানবো হঠাৎ কাউকে। ভাঁড়ের কথায় যারা আমূল বিদ্ধ হয় তারাই হাসে বেশী।

বিদূষকের বর্ণালী পোষাক দাও আমাকে। দাও অবাধ স্বাধীনতা, আমি মুছে দেবো পৃথিবীর সমস্ত পাপ। অবশ্যই মানুষ যদি মেনে নেয় আমার ব্যবস্থা-পন্থা।

ডিউক বলে ওঠেন, হয়তো তুমি অন্যের পাপের কথা বলতে গিয়ে নিজেই করে বসবে চরম অপরাধ। যদি একবার তুমি সবাইকে বিদ্রূপ করার অধিকার পাও, তাহলে নিজের সমস্ত সঞ্চিত হলাহল ঢেলে বিষাক্ত করবে সমস্ত পৃথিবীটাকেই।

—আমার বিদ্রূপ-বর্ষণে ব্যক্তি বিশেষ নয়, সব মানুষই হবে আসল শিকার। ফলে ক্ষতি হবে না কারোর। উপকার হবে সবার। কথা শেষ হয় নি জেক্‌সের, সহসা ঢোকে খোলা তলোয়ার হাতে অর্ল্যাণ্ডো।

চীৎকার করে বলে—আমার আদেশ, খাওয়া বন্ধ কর ! থাম !

জেক্‌স জানালে, সে এখনো স্পর্শই করেনি খাদ্য।

ডিউক দেখছিলেন, সুন্দর সুদেহী কিশোর, পরিশ্রমের ক্লান্ত ও উন্মাদনা চোখেমুখে। বললেন, দুর্দশাই কি তোমাকে সাহসী করেছে ? নাকি তোমার স্বভাবেই আছে এই অভদ্রতা ?

—আমি সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। ভদ্রতা জানি। তবু বারণ করছি, আমার প্রয়োজন না শেষ হলে কেউ-ই খাবার ছোঁবে না।

—তবে এসো, এক সঙ্গে বসে খাও।

—এতো ভদ্রভাবে কথা বলছেন। ক্ষমা করুন আমাকে। ভেবেছিলাম, আর্ডেনের জঙ্গলে সবকিছু বন্য। তাইতো হিংস্র হয়ে উঠেছিলাম, কণ্ঠে বেজে উঠেছিল কঠিন আদেশের স্বর। যাই হোক্ আপনি সমৃদ্ধির সুখ যদি কোনদিন দেখে থাকেন, যদি গীর্জাধ্বনি শুনে থাকেন কোনদিন, অন্যের আতিথ্য যদি পেয়ে থাকেন, করে থাকেন আতিথেয়তা, যদি ঝরে থাকে সমবেদনার অশ্রু তাহলে আপনার কাছে আমি ভদ্র। এই লুকিয়ে রাখলাম আমার তলোয়ার।

ডিউক তখন ডাকলেন, এসো, তাহলে দেরী না করে খেতে বসে যাও।

অর্ল্যাণ্ডো জানালো—মৃগের যেমন শিশু, আমারও তেমন আছে এক ভালবাসার বৃদ্ধ, ক্ষুধায় মুমূর্ষু, তার খিদে আগে মেটাতে হবে।

—ঠিক আছে। তুমি যাও, তাকে না নিয়ে আসা পর্যন্ত আমরা কেউ খাদ্য স্পর্শ করবো না।

আশ্বস্ত অর্ল্যাণ্ডো ছুটে চলে গেল। তার দিকে চোখ রেখে ডিউক বলে উঠলেন—দেখলে তো, একা আমরাই দুঃখী নই, আমরা যে দৃশ্যের নটনটী এই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে, তার চেয়েও শোকাপ্লুত দৃশ্যও আছে।

সুযোগটা পেয়ে গেল জেক্‌স। সেও শুরু করে দিল—এই দুনিয়া এক রঙ্গমঞ্চ।

পুরুষ আর নারী তো এখানে শুধুই অভিনেতা-অভিনেত্রী।

ওরা নেপথ্যে চলে যায়, আবার আসে।

একজন মানুষই বিভিন্ন ভূমিকায় এসে দাঁড়ায় মঞ্চে।

তার জীবন-নাটক তো সপ্তম অঙ্কে সমাপ্ত।

প্রথমে যে শিশু, দাই-মার কোলে শুয়ে যে কাঁদে, মুখ দিয়ে তোলে দুধ—

তারপর সে বিদ্যালয়ের ছাত্র। পাততাড়ি বগলে, মুখে প্রভাতের ঝলোমলো দীপ্তি, শামুকের মত গুটি গুটি চলে আর গজগজ করে—বিদ্যালয়ে যেতে সে নারাজ।

তারপর এল প্রেমিক—হাপরের মতো তার দীর্ঘশ্বাস, প্রিয়ার চোখ নিয়ে রচনা করে বিষাদ গাথা।

তারপরে সৈনিক। মুখে বিদেশী গান—ঝাঁকড়া দাড়িতে চিতা-বাঘের মত দেখায়, আত্মসম্মান সম্পর্কে হুঁশিয়ার, ঝগড়ার জন্যে মুখিয়ে আছে, চট করে বাধায়ও বটে। তুচ্ছ যশের জন্য কামানের মুখেও জীবন ডালি দিতে সে পারে।

তারপরে এলেন বিচারপতি। সুগোল তার ভুঁড়িটি, তাঁর জোব্বার চারিধার ঘুষের টাকা দিয়ে মোড়া—চোখের দৃষ্টি কঠোর, কাট ছাঁট দাড়ি—যখন তখন আওড়ান সুভাষিতবলী আর মামুলি উপদেশ। এমনি করেই হাকিম তাঁর অভিনয় শেষ করেন।

ষষ্ঠ অঙ্ক এল এবার। মানুষ তখন বদলে গেছে। জরাজীর্ণ সে, পায়ে চটি, ঢিলেঢোলা পাতলুনে মোড়া মানুষটি, নাকে চশমা একপাশে ঝোলে মস্ত থলে। বহু যতনে রক্ষিত, যৌবনে ব্যবহার করা মোজা তার পায়ে, অস্থিসার পায়ে সে মোজা ঢিলে হয়। তার সেই পুরুষের জোরালো সুর শিশুর দুর্বল কণ্ঠে পরিণত। কথা কয়না যেন শীস দেয়।

তারপরে সর্বশেষ দৃশ্য। এই অদ্ভুত ঘটনা বহুল ইতিহাসের এই এই তো ইতি, এই তো যবনিকা। এ যেন দ্বিতীয় শৈশব। তার

সঙ্গে আছে অতীতের বিস্মৃতি। দাঁত নেই, চোখ নেই, রুচি নেই—আর কিছুই নেই।

আর সেই সব কথা শেষ হতেই য্যাডামকে নিয়ে ঢোকে অর্ল্যাণ্ডো। তারপর শুরু হয় ভোজন। ডিউকের অনুরোধে গান গায় অ্যানিয়েনস—

বয়ে যাও ওগো, হিমেল বাতাস
তুমি তো নিষ্ঠুর নও মানুষের কৃতঘ্নতার মত
তোমার দাঁত তো নয় বাঘের নখর
তোমায় দেখি না, কেবল প্রবল ঝাপটা
তোমার কাঁপন দিয়ে যায়।
ওগো আকাশ, তুমিও জমতে পারে শীতে
তোমার নির্মমতা কি অকৃতজ্ঞের মত তীব্র অতো?
জলকে কেন বরফ করো!
তোমার ঘাতকটা কি তেমন, যেমন
বন্ধুকে বন্ধু বেভুল ভুলে হারায়—

এতক্ষণে অর্ল্যাণ্ডোর পরিচয় পেলেন ডিউক। স্যার রোল্যাণ্ডের কনিষ্ঠপুত্র সে। তিনি গুহায় আমন্ত্রণ করলেন তাকে। যেখানে বসে শুনবেন তার জীবন কাহিনী।

এগার

ডিউকের রাজপ্রসাদ।

আর্ডেন অরণ্যাণীর মুক্ত অবাধ জীবনের বদলে এখানে জমেছে অঢেল নিষ্ঠুরতা। জমেছে কত ক্রুর ষড়যন্ত্র।

ডিউকের আদেশে এসেছে অলিভার।

সে জানায়—অর্ল্যাণ্ডো'কে সে দেখেনি।

বিশ্বাস হয় না ডিউকের। তিনি শুধালেন দ্বন্দ্ব যুদ্ধের পর তাকে দেখোনি ?

—না। অলিভার ঘাড় নাড়ে।

—অসম্ভব। আমি ভদ্র মানুষ। দয়া আছে বলেই খুঁজছি তোমার ভাইকে। নইলে প্রতিশোধ নিতাম তোমার ওপরেই। তাকে কিন্তু খুঁজে বার করতেই হবে। যাও, তাকে খুঁজে আন এক বছরের মধ্যে। জীবিত অথবা মৃত, তাকে না পেলে, তোমার এরাজ্যে ঠাঁই নেই, আর ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবে তোমার।

আদেশ শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল অলিভার। বললো—ভাইয়ের ওপর এতটুকুও মায়া মমতা নেই আমার।

—তাহলে তো ভারী খারাপ লোক তুমি। এই কে আছো এখানে, দূর করে দাও ঐ দুর্জনকে। বাজেয়াপ্ত কর ওর সম্পত্তি। পাঠাও নির্বাসনে। হতভাগ্য অলিভার চলে যায় ধীর পায়ে—

ডিউকের কাছে আসার পিছনে ছিল লাভের প্রত্যাশা।

লাভ দূরে থাক, যা ছিল তাও গেল। সে এখন নির্বাসিত, ভূমিহীন সর্বহারা।

বারো

আর্ডেনের অরণ্যপ্রান্তে দেখা গেল অর্ল্যাণ্ডোকে।

গহীন বনে রাত মোহানায় উদাস ঘুরে বেড়াচ্ছে অর্ল্যাণ্ডো।

মুখ তার বিশীর্ণ, চোখের কোণে কালি। তলোয়ার নেই হাতে।

গাছের ডালে ডালে, পাতায় পাতায় সে রেখে যাচ্ছে তার ভালবাসার স্বাক্ষর।

বলছে, কবিতা, এখানে তুমি থাক আমার ভালবাসার সাক্ষী হয়ে। চাঁদ, বিবর্ণ আকাশে থেকে জোছনা ছড়াও। নাম বলে দাও

তোমার মৃগয়া সঙ্গিনী রোসালিণ্ডের। সে যে আমার জীবন-ধাত্রী।

ছুটে গেল অর্ল্যাণ্ডো। প্রেম তাকে পাগল করেছে। এদিকে আসছিল বৃদ্ধ করিণ ও টাচস্টোন।

—মেষপালকের জীবন কেমন লাগছে? প্রশ্ন করলো করিণ।

টাচস্টোন বললো—মেষপালকের জীবন বিচ্ছিরি। তবু আমার ভাল লাগে এ নিঃসঙ্গ জীবন। আবার সমাজ-জীবন নেই বলে খারাপও লাগে। এই খোলা-মেলা জীবন আমার প্রিয়, আবার রাজপ্রসাদ থেকে দূরে আছি, অসহ্য, একঘেয়ে লাগে। আসলে, এই মিতাচারী জীবন ভাল লাগলেও প্রাচুর্যহীনতা আমার পেটে ঠিক সহ্য হয় না। তা, তোমার কেমন লাগে বললে না তো?

তখন কবিণ বললে—অসুখ হলে মানুষের মনে সুখ থাকে না। অসুখ মানেই অভাব। অর্থ-বিত্তের অভাব, সঙ্গতি ও আনন্দের ভাব। এই তিনটি অভাবই ডেকে আনে অসুখ। বৃষ্টি আসে মাটি ভিজিয়ে। আগুন আসে পুড়িয়ে। ভাল মাঠে পুষ্ট হয়ে ওঠে ভেড়ারা। সূর্যের অভাবে রাত নামে। প্রকৃতির কাছে কত কিছু শেখা যায়।

—বাঃ, তুমি তো জন্ম দার্শনিক। টাচস্টোন শুধায়—দরবারে গেছ কখনো?

—না।

—তাহলে আর আশা নেই।

—কেন?

—সহবৎ ই-শিখলে না এখনো।

—দরবারে যাইনি বলে?

দরবারে জায়গা না পেলে সহবৎ শিখবে কি করে? সহবৎ না শিখলে ভদ্র হবে কি করে? অভদ্রতা মানে পাপ। আর পাপে নরক বাস।

এইবারে ওরা যখন পরস্পরকে বিদ্ধ করছে প্রশ্নবাণে, তখন এক-

খণ্ড চিরকুট পড়তে পড়তে আসে রোসালিণ্ড।

চিরকুটে লেখা—পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে খুঁড়ে বেড়াও আরেক প্রান্ত। কোথাও পাবে না রোসালিণ্ডের মত অরূপ-রতন। তার নাম হাওয়ার ডানায় ভর করে উড়ে যায়, ছড়িয়ে পড়ে। কোন সুন্দর ছবিও তার সমকক্ষ নয়। আমার স্মৃতিতে আর কোন মুখ নয়, যেন থাকে শুধু তার মুখচ্ছবি।

লেখা শুনে টাচস্টোন ফোড়ন কাটে, আরে, এ গান তো গয়লা বৌদের বাজারে চলার ঢঙে। সুষমা নেই। গতি নেই···

—চোপ মূর্খ, দূর হও। ধমক দেয় রোসালিণ্ড।

ধমকে দমে না টাচস্টোন। বলে—বহুত আচ্ছা, এখুনি শুনিয়ে দিচ্ছি কয়েকটা নমুনা।

বিহঙ্গ বিহঙ্গী খোঁজে
খুঁজি আমি রোসালিণ্ড,
ম্যাও চাও ম্যাও গিন্নী
আমি চাই রোসা
ফসল যারা কাটে, বাঁধে আঁটি
রোসা নিয়ে গাড়ি চলে গুটি গুটি
মিষ্টি ফলের বাইরেটা টক
রোসাও তেমন বাইরেটা টক।
ভেতরে মিষ্টি।

—ইস্, অমন কাব্যি করে নিজের রুচি নষ্ট করছেন।

—চুপ, এগুলো আমি গাছে পেয়েছি। গাছে গাছে ফল ধরেছে।

সিলিয়া কি পড়তে পড়তে এদিকে আসছে। তার হাতেও অনুরূপ চিরকুট। সে পড়ে যায়—তিলে তিলে রোসা তিলোত্তমা, ঈশ্বরের আশীর্বাদে হেলেনার রূপ আর মন তো সেই নয় ক্লিওপেট্রার মহিমা যেন। আতালান্তার ভঙ্গী এবং বাকী যা কিছু নম্রতা সব লুক্রেশিয়ার।

এবার সিলিয়া টাচস্টোন আর করিণের দিকে তাকালেন—এখন তোমরা যাও।

চলে গেল ওরা।

মুখোমুখি হল দুই সঙ্গী।

—শুনলে তো? সিলিয়া শুধায়। তোমার নাম এখন গাছে গাছে, বাকলে বাকলে খোদিত। অবাক হওনি?

—লোকটা কে বলতো?

—ওমা, তুমি এখনো জান না?

—বল না, কে সে!

—চার্লসকে হারিয়ে যে পালোয়ান জিতে নিল তোমার হৃদয় আর গলার হার।

—অর্ল্যাণ্ডো?

—হ্যাঁ, অর্ল্যাণ্ডো।

—এখানে কোথায় সে, কেমন আছে? তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল? কিছু বললো?

—আরে, আগে বলতে দাও আমাকে।

—বেশ, বলো তবে।

—এক গাছের নীচে খসে পড়া ফলের মত পড়েছিল সে।

—সে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের গাছ। রোসালিণ্ড দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

—চুপ, সিলিয়া দেখালো। ঐ তো ও আসছে।

—তাইতো কি আশ্চর্য! চল আমরা সরে যাই।

ওরা সরে যায়। জায়গাটা অধিকার করে নেয়—জেকস আর অর্ল্যাণ্ডো।

জেকস বলে—সঙ্গ দিয়ে আপনি আমায় কৃতজ্ঞ করেছেন। কিন্তু সত্যি বলতে, নিঃসঙ্গতা আমার ভাল লাগে।

—আমারও একই অনুভব, অর্ল্যাণ্ডো জানায়, ভদ্রতার খাতিরেই ভালো লাগে আপনার সঙ্গ।

—অতএব বিদায় বন্ধু, যত কম দেখা হবে, ততই ভাল।

—বরং অচেনা থাকলেই ভালো হত।

—একটা অনুরোধ, গাছের ডালে, পাতায়-ফুলে থাকলে যা ত গান কবিতা লিখে ওগুলো নষ্ট করবেন না।

—একটা প্রার্থনা, আমার কবিতা এনে অমন বিচ্ছিরি করে পড়বেন না।

—মশাই এর একটাই খুঁত, মশাই প্রেমে পড়েছেন।

—সেই খুঁতই মশাইয়ের মহৎ গুণ।

—আমি এক বোকা লোক খুঁজছিলাম, হঠাৎ আপনার সঙ্গে দেখা।

—খুঁজে দেখুন সে জলে ডুবে মরেছে।

জেক্স তো থ। আরে সেখানে নিজের ছায়া ছাড়া আর কিছুই যে দেখতে পাবো না।

—সেই ছায়াই তো গণ্ডমুর্খ বোকার।

—দূর মশাই, আর বাতচিত না আপনার সঙ্গে। চলি, শ্রীযুক্ত প্রেম।

—যাক, আমিও রেহাই পেয়েই বাঁচি, আমি শ্রীযুক্ত বিষাদ।

জেক্স চলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে এতক্ষণের আলাপন শুনতে থাকা দুই সখী এসে হাজির।

সিলিয়াকে কানে কানে রোসালিণ্ড বললে—বদমাইস চাকরকে যে ভাবে কথা বলে, আমরাও সে ভাবে কথা বলবো কেমন?

তারপর ডাকলো—ওহে বনচারী।

—বল, কি চাই? অর্ল্যাণ্ডো জবাব দেয়।

—তোমার ঘড়িতে এখন ক'টা?

—উঁহু, বলা উচিত "বেলা কত" বনে তো ঘড়ি নেই।

—খাঁটি প্রেমিকও নেই। রোসালিণ্ড বলে—খাঁটি প্রেমিক থাকলে প্রতি মুহূর্তের হাহাকারে প্রতি ঘণ্টার দীর্ঘশ্বাসে ধরা যেত

ময়ের মৃদু-পদক্ষেপ।

—মৃদু ? সময়ের পদক্ষেপ মৃদু কেন ?

—সময় ? হাসল রোসা, বিভিন্ন মানুষের কাছে সময় চলে বিভিন্ন রকম। কারো সময় চলে হেলে দুলে দুলকি চালে, কারো লে হোঁচট খেতে খেতে, কারো লাফিয়ে ছাপিয়ে। আবার কারো ময় একদম অচল, থুরথুরে বুড়ি।

—যেমন ? উদাহরণ চাই।

রোসালিণ্ড বোঝাতে থাকে—বিয়ে ও বাগদানের মাসে কশোরীদের সময় কাটে বড় ঢিমে তালে। সাতদিন যেন সাত বছর নে হয়।

—কার সময় কাটে দুলকি চালে ?

—যে শাস্ত্র পড়েনি, লাতিন জানে না যে পাত্রী, এবং যে বুড়োর গাঁটে বাত নেই—তাদের। কেন জানেন ? পাত্রীটিকে নড়তে হয় া তাই ঘুমুতে হয় বিভোর হয়ে। বুড়ো মানুষটি ব্যথা পান না লেই স্বচ্ছন্দে কাটান সময়। ব্যর্থ জ্ঞানের বোঝা চাপেনি একজনের াথায়, অন্যজনের মাথায় নেই দারিদ্র্যের কশাঘাত। তাদের সময় াই চলে দুলকি চালে।

—লাফিয়ে চলে কার সময় ?

—ফাঁসি যাবে যে। সময় যত আস্তেই চলুক, সে তো জানে, ত দ্রুত পৌঁছে যাবে ফাঁসি কাঠে।

—সময় কার অচল অনড় ?

—উকিলের। কাছারি বন্ধ যাবে যখন, কাজ কারবার থাকে না কছুই, তখন সে ভুলেই যায়, ঘড়িটা বন্ধ হ'ল কিনা।

—বাহ, বেশ তো। তা মশাইয়ের নিবাস কোথায় ?

—এই বনের ধারেই। সঙ্গে আছে এই রাখাল বোনটি।

—আশ্চর্য এই বনেই থাকেন। অথচ উচ্চারণ এত স্পষ্ট মার্জিত, ধন অনেক দূরে থাকেন।

—অনেকেই এই ভুল করে। আসলে আমার শহুরে কাকাই শিখিয়ে ছিলেন। প্রেমে পাকা-পোক্ত মানুষ। তবু পড়েও ছিলেন। তবু কত বক্তৃতা দিতেন প্রেমের বিরুদ্ধে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি মেয়ে নই যে বোকামি করবো মেয়েদের মত।

—মেয়েদের মস্ত কি বোকামির কথা বলে ছিলেন মনে পড়ে?

—বোকামির বড় ছোট নেই মেয়েদের—সব ডাবল পয়সার মত অবিকল একরকম।

—বল না, দু'একটা শোনা যাক, কি রকম।

—উঁহুঁ, প্রেম-পাগল মানুষদের বলে কেন বৃথা সময় অপচয় করবো? বরং বনে যে মানুষটা গাছ প্রান্তরে ফুলে পাতায় রোসার নাম খোদাই করে বেড়াচ্ছে তাকে পেলে কিছু বলা যেত।

—আমি সেই পাগল প্রেমিক অর্ল্যাণ্ডো। ওই দাওয়াই বাতলে দেবে আমাকে?

ওর দিকে তাকিয়ে ছদ্মবেশী রোসালিণ্ড মাথা নাড়ে—উঁহুঁ, কাকা যে লক্ষনগুলো বলেছিলেন সেগুলো তো ঠিকঠাক মিলছে না। প্রেমিক হবে তার পোষাক, শরীর ও চারপাশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন হবে খেয়ালী, আত্মমগ্ন, এলোমেলো ভাব ভঙ্গীর হেলাফেলা পোষাকের বিষাদ মানুষ। তুমি সেরকম নও। তুমি নিজেকেই ভালবাস। অন্যকে নয়।

অর্ল্যাণ্ডো শত চেষ্টা করে বোঝাতে যে সে রোসাকেই ভালবাসে।

রোসা শুধায়—তোমার কবিতার মত ভালবাস?

—হায় নারী, কবিতা বা কোন যুক্তি দিয়ে কি তা বোঝান যায়?

অবশেষে রোসা জানায়—এ রোগের দাওয়াই সে জানে।

তক্ষুনি বলে ওঠে অর্ল্যাণ্ডো—দরকার নেই আরামের।

—বেশ তবে, রোসালিণ্ড মুচকে হেসে বলে, রোজ যদি আমার কাছে আসতে, আমাকে রোসালিণ্ড বলে ডাকতে রাজী থাক, তাহলে

তোমাকে সুখ দিতে পারি। তুমি এসে কেবল প্রেম করবে আমার সঙ্গে।

অর্ল্যাণ্ডো তাতেই রাজী। এই খেয়ালী প্রেম প্রেম খেলায় যে তার রোগ মুক্তি নয়, নতুন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে প্রিয়তমার।

তের

আর্ডেনের বনাঞ্চলে আজ কি মধুমাস।

জানি না। গাছে গাছে, ডালে ডালে ফুল ফুটুক না ফুটুক, বসন্ত এসেছে আজ নরনারীর মনে।

প্রেম প্রেম খেয়ালী খেলায় বিভোর অর্ল্যাণ্ডো ও রোসালিণ্ড।

আর এই বনেরই অন্য প্রান্তে নির্বোধ টাচস্টোনের বুকেও ঝরছে মধুমাসের বসন্ত নির্ঝর।

রাখালিয়া অড্রেকে সে বেঁধেছে ভালবাসার শপথে।

অড্রে বোঝে না কবিতা।

তবু তাকে কাব্য শোনায় টাচষ্টোন। অদূরে অন্তরালে দাঁড়িয়ে হেসে ফেলে জেকস।

এ যেন বেনা বনে মুক্ত ছড়ানো। এতে দুঃখ পায় টাচষ্টোনও।

বলে, কারো কাব্যে যদি তারিফ না পেলে। যদি সমজদার না জুটলো চমৎকার বুদ্ধি দীপ্ত কথার, তবে সেটা সরাই খানায় আমার হাজার টাকা থাকাব মত হবে না? ইস্ অড্রে, তুমি যদি একটু কাব্যময়ী হতে?

—কাব্যময়ী? অবাক অড্রে বলে—সেটা কি গো? কথায় কাজে ভাল হওয়া না কি......

—যাঃ, টাচষ্টোন বলে, কবিতা হল কল্পনা, বুঝলে? প্রেমিকরা,

কবিতার ভাষায় প্রেম নিবেদন করে—আসলে তাদের কোনো অনুভূতি নেই।

—তবু কাব্যময়ী হতে বলছো আমাকে ?

—তবু বলছি।

—আর আমি যে দেবতাদের কত বলি, আমাকে, ভাল মেয়ে করে দাও……

—তা ঠিক।—তবে…তবে কি জান, কোন খারাপ কুশ্রী মেয়েকে সৎ স্বভাব করা যা, নোংরা প্লেটে ভাল মাংস পরিবেশন করাও অনেকটা সেরকম।

—আমি সুচ্ছিরি না হতে পারি! নোংরা নই। অড্রে ক্ষেপে ওঠে।

তাকে শান্ত করে টাচষ্টোন—জান, পাদ্রীর কাছে গিয়েছিলাম, তিনিই এখানে আসতে বলেছেন। আমি তোমাকে বিয়ে করবো অড্রে।

পাদ্রীর নাম স্যার অলিভার মাটেকসট।

তাকে দেখে বলে ওঠে টাচষ্টোন, আসুন, আসুন, এই যে গাছ তলায় বিয়ে হবে নাকি গীর্জায় যেতে হবে আমাদের।

—কিন্তু এখানে মেয়েকে কে সম্প্রদান করবে ?

পাদ্রীর প্রশ্ন শুনে নারাজ হয় টাচষ্টোন, না না মশাই, কারো হাত থেকে ওকে দান হিসাবে নিতে পারবো না।

—কি মুশকিল! দান হিসাবেই তো নিতে হয়।

—নইলে বিবাহ সিদ্ধ হবে কি করে ?

ঠিক সময়েই আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে জেকস বলে, আমিই সম্প্রদান করবো কনেকে। তবে বিয়ে হবে গীর্জায়। এখানে ভিখারীর মত নয়। ভাল পাদ্রী ডাকি তিনি বুঝিয়ে দেবেন বিয়ে কত পবিত্র। এই পাদ্রীকে দিয়ে হবে না।

খুশী ছিল টাচষ্টোন।

এখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়—অন্য পাদ্রী কেমন হবে কে জানে।

এ পাদ্রীটা বোধ হয় ভাল। ব্যাটা কিছু জানে না। ভাল বিয়ে দিতে পারবে না। ফলে বনিবনা না হলে, পরে বিচ্ছেদটা সোজা হবে।

এই ফাঁকে জেকৃস তার স্বগতোক্তি শুনে ফেলল। বললো—ঠিক হ্যায়, তোমাকে দারুণ বুদ্ধি বাতলে দেবো, চলো ?

অগত্যা টাচস্টোন ডাকে, এসো অড্রে। আমরা বিয়ে করতে যাই গীর্জায়। চলি পাদ্রী সাহেব।

তুমিও কেটে পড়, পাদ্রী তো চটে লাল। —বয়েই গেল ! হুঁ, তোমরা বিয়ে না করলে কি ঘুচে যাবে আমার পাদ্রীগিরি ?

চোদ্দ

আর্ডেনের অরণ্য প্রান্তরে পর্ণ কুটিরে আলাপে বিভোর সিলিয়া ও রোসালিণ্ড।

এখনো দেখা নেই অর্ল্যাণ্ডোর।

রোসালিণ্ড অধীর প্রতীক্ষায় স্তব্ধ।

—এমন পবিত্র মানুষটা ! রোসা বলে, ভোরে আসবে বলে এখনো এল না কেন ? তোর কি মনে হয়, ও ভালবাসা সৎ নয় ?

সিলিয়া হাসলো—ভালোবাসা সৎ, তবে আমার মনে হয়, ভালই বাসেনি।

—তবে যে শপথ করলো।

—ও তো মাতালের প্রলাপ। প্রেমিক ও মাতাল দুজনেই ভুল কথা নিয়ে লড়ে।

রোসার তো প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা।

বিদ্রূপে সিলিয়া হাসে।

বলে—চমৎকার পুরুষ। চমৎকার শপথ করেন, চমৎকার ভাবেন প্রিয়ার হৃদয় নিয়ে ভাবেন না…

সিলিয়ার কথার শেষে বৃদ্ধ করিণ আসে।

সে বলে, যদি তোমরা প্রেমে পাগল মেষপালক ও তার প্রেমিকাকে দেখতে ইচ্ছে করো, তবে চলো আমার সঙ্গে। সে এক সুন্দর ছবি। একদিকে গনগনে রাঙা ঘৃণার আগুন, অন্যদিকে অপার্থিব প্রেমের মলিন ইশারা।

লাফিয়ে ওঠে রোসা। সে রাজী। বলে—চলো, আমরা দেখতে যাই। প্রেমের নাটক আমাকে কি ভূমিকায় রেখেছে।

পনের

সিলভিয়াস, তরুণ মেষপালককে ; পাঠক, আমরা আগেই চিনেছি। এবার আর্ডেন প্রমোদোদ্যানে দেখবো তার প্রিয়ংবদা ফিবিকে।

সিলভিয়াস স্বভাব কবি। নাগরিক নয় সে, জানে না ছলাকলা। তাই তার ব্যাকুল আত্মনিবেদনে সরল সহজ কবিতা দুলে ওঠে।

ফিবির হাতে ধরে সে বলছে—বলতে পার, ভালবাসো, না ঘৃণা করো আমাকে। তবু মিষ্টি করে বল, যায় যদি প্রাণ, যাক না। আঘাত করতে ক্ষমা চেয়ে নেয় জল্লাদও : তুমি কি নির্মম হবে তার চেয়েও ?

এ সময়ে ঢোকে রোসালিণ্ড, সিলিয়া এবং করিণ। ওরা দেখতে পায় না।

—এ মা, তোমার জল্লাদ হবো কেন ? ব্যথা দেবো না বলেই তো ভুলতে চাই তোমাকে। তুমি না বলতে, আমার নয়ন মানুষ খুন করতে পারে ? কি মিথ্যে ! কি মিথ্যে ! চোখ ফুলের পাপড়ির

মত এত কোমল—আবার সেই চোখ কিনা কসাইয়ের মতো খুন করে মানুষ ?

এই তো চোখ কোঁচকালাম—কই, তুমি তো মরে গেলে না ! অন্ততঃ মরার মত চিৎ হয়ে পড়ে যাও—কই, পড়লে না তো ? তা হলে দোষ দিও না এই চোখের, ছুঁয়ো দিয়ো না। মিথ্যুক। আমার চোখ তোমার বুকে চোট দেয় না, চোখের সে তেজ আমার নেই।

অলক্ষ্যে, এই নিষ্ঠুর কথা শুনে নিশ্চুপ থাকতে পারল না রোসালিণ্ড।

বেরিয়ে এসে বললো—কে তুমি ? কার আত্মজা যে এমন অহংকারে কথা বল ? ঘৃণা কর নিষ্পাপ ফুলকে ? নিজে তো নয় সুন্দরী, তবে কেন, কিসের গর্ব তোমার ? উঁহু, অমন দৃষ্টিতে তাকিয়ো না, ভেবো না, তোমার ঐ কালো ভুরু, কুঞ্চিত চুল, বিবর্ণ নরম গাল ঐ কালো চোখের তারা মন ভোলাবে আমার।

আহারে নির্বোধ রাখাল, কেন যে তুমি, ওর পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছো।

রোসালিণ্ড আরো অনেক উপদেশ দিয়ে যাচ্ছিল। ফিবি শুনছিল না। অর্ল্যাণ্ডোকে ঘিরে তার নয়ন মুগ্ধতায় স্থির।

সে খানিক পরে, আস্তে আস্তে বলে, ওগো মিষ্টি মানুষ, যতই গালাগাল দাও, তবু জেনো, ওর ভালবাসার চেয়ে আমার বেশী পছন্দ তোমার ঐ সুবর্ণ গালটিকে।

রোসা তৎক্ষণাৎ রেগে বলে, ওহে জানোতো, মাতাল ভুল বকে, আমিও কি তার চেয়েও বেশী। আর সত্যি, তোমাকে ভাল লাগছে না আমার। তার চেয়ে রাখালকে চটপট বিয়ে করে ফেল।

এরপর সিলিয়ার দিকে চেয়ে বললো—রোসা, চল এবার যাই আমরা।

ওরা চলে যেতে ফিবি বলে উঠল, এতক্ষণে মনে বাজল ঐ কথাটি প্রথম দর্শনেই জন্ম নেয় ভালবাসা।

—ফিবি, কেঁদে ফেললো সিলভিয়াস।

—কি বলছো ?

—দয়া কর আমায় প্লিজ ফিবি।

—দয়া ? তোমার জন্য দুঃখ হয় আমার। চলে যাক, আমার দুঃখ, যত হতাশা।

—আমি তোমাকে ভালবাসি মিত্রের মত।

—আমি কিন্তু বন্ধুত্ব চাই না। চাই স্ত্রীর স্বীকৃতি দিতে।

—সেই তো তোমার লাভ। ভেবে ছাখো, আগে ঘৃণা করতাম, এখনো তোমাকে ভালবাসি না, তথাপি তুমি কাছে আছ আমার, এইটুকুই সুখ।

—ঐ চ্যাংড়াটিকে চেন নাকি। ফিবির প্রশ্ন।

—চিনি না। এ বনে জায়গা বসতবাড়ি কিনেছে—প্রায়ই দেখতে পাই।

—তুমি ভেবোনা ওর প্রেমে পড়েছি। ফিবি বলে যায় ছোকরাকে না দেখলে যে কোন মেয়েই প্রেমে পড়তে পারে। তবে আমি তেমন নই। আমি ওকে ঘেন্না করবো, একটুও ভালোবাসবো না।

—দেখ না, আচ্ছা করে একটা চিঠি লিখব, অনেক অনেক গালাগাল দিয়ে, হ্যাঁ ভাল কথা, চিঠিটা তুমি ওকে পৌঁছে দেবে তো ?

—নিশ্চয়ই ? খুশী হয় সিলভিয়াস।

—চল, সিলভিয়াস চল, এক্ষুণি লিখে ফেলতে হবে চিঠিটা, মাথার মধ্যে কিলবিল কবছে কথারা।

ষোল

শহুরে কোলাহল ছেড়ে দূরে গড়ে উঠেছে সহজ স্বচ্ছন্দ গতি-বাহিত এক সামাজিক পরিবেশ।

যেখানে কুটিলতা হানেনি আঘাত। কৃত্রিমতা দেয়নি স্পর্শ অভিশাপ।

সেই পরিবেশে, রোসালিণ্ডের কুটিরে এসেছে আজ জেক্স।

এসেই সে বললে—সুন্দর যুবক, এলাম ভাল করে আলাপ জমাতে।

—মশাই তো শুনেছি ভাবুক। মুখ খোলেন না। ছদ্মবেশী রোসালিণ্ড মসকরা করে।

—ঠিক বলেছ। হাসির বদলে ওটাই আমার পছন্দ।

—বেশী হাসি কিংবা বেশী বিষণ্ণতা দুটোরই পরিণাম খারাপ।

—আমার ভাল লাগে ভাল গম্ভীরতার মধ্যে ডুবে থাকা। আর নিজস্ব বিষণ্ণতা ? বহু উৎস থেকে জন্ম তার। আমার বহু ভ্রমণ ও ভূয়োদর্শনের ফসল। চোখ বুজলেই আমার মন ভরে যায় ঐ সব খেয়ালী বিষণ্ণতার যাদুস্পর্শে।

রোসালিণ্ড বললে—মশাই তবে ভ্রমণ বিলাসী। তা আমার মশাই এক কথা, বোকা হয়ে হাসবো, কদাচ অভিজ্ঞ হয়ে মুখ ঢাকবো না বিষাদে।

হঠাৎ ছেদ পড়ল আলাপে। ঢুকলো অর্ল্যাণ্ডো। ঢুকেই বললে—রোসা, এদিন শুভ হোক প্রিয়া।

জেক্স উঠে পড়ল—কাব্য করে কথা বললে আমি থাকি না।

জেক্স যেন পালিয়ে বাঁচল।

—তারপর অর্ল্যাণ্ডো, অভিমানী মুখে রোসা বলে উঠলো—

নিজেকে তো প্রেমিক ভাবা হয়। এত দেরী করলে আর এসো না এখানো।

—রোসা প্রিয়া, প্লিজ ক্ষমা কর। আর্তনাদ করে ওঠে অর্ল্যাণ্ডো।

—বেশ এসো। শুরু করা যাক প্রেমালাপ। ধর, আমি রোসালিণ্ড তোমাকে চাইছি না, তুমি কি করবে ?

—মরবো।

—না না, মরতে হলে অন্য কেউ মরুক, তুমি নও। এ পৃথিবীর বয়স হাজার বছর, এখনো কেউ মরেনি প্রেমের বিষে। প্রেমের জন্য প্রাণ দিতে চেয়েছিলেন ট্রাজান বীব ট্রয়লাস।

কিন্তু মরলো শেষে এক গ্রীকের দণ্ডাঘাতে। একরাতে স্নান করতে গিয়ে মরেছেন আদর্শ প্রেমিক আথিদোস। যিনি হৃদয় দিয়েছেন রাজা লিয়াদার দেবদাসী হেরাকে। যদি ঐতিহাসিকরা বলেন, হেরার প্রত্যাখ্যানই তাকে ঠেলে দিয়েছে মৃত্যু পথে।

তাহলে দেখ, মানুষ মরে, তাদের শরীর কুড়ে খায় কীটে. কেউ মরে না ভালবাসায়।

অর্ল্যাণ্ডো শুধায়—আমার আসল রোসা এই কথা বললে ভাল লাগতো কি আমার ? তার নিষ্ঠুর কথাতেই কত সহজে ঘটতে পারে আমার মৃত্যু।

হাসলো রোসালিণ্ড—এই হাত সাক্ষী, একটি মাছিও হত্যা করবো না আমি। এখন এসো, আমি হবো তোমার রোসালিণ্ড। যা চাও, তাই পাবে।

—রোসা, আমায় দাও ভালবাসা। অর্ল্যাণ্ডো কেমন গদগদ হয়ে যায়। সপ্তাহের প্রতিটি দিন তোমায় দেব আমার উষ্ণ ভালবাসা। আমাকে তুমি স্বামী হিসাবে চাও না ?

—চাই—তোমাকে চাই, তোমার মত হাজারটাকে চাই।

—মানে ? অর্ল্যাণ্ডোর চোখ ছানা বড়া।

—তোমার কি স্বামীত্বের যোগ্যতাও নেই ?

—কেন থাকবে না ?

—তবে ? ভাল জিনিস যত পাব ততই ভাল। এই বোনটি, আয়না, পাদ্রী সেজে বিয়ে দে আমাদের।

তক্ষুনি রাজী সিলিয়া। কিন্তু বিয়ের মন্ত্র যে তার অজানা। কি হবে ?

—দাঁড়াও দাঁড়াও, রোসালিণ্ড বলে, শিখিয়ে দিচ্ছি, হ্যাঁ, তুমি কি অর্ল্যাণ্ডো পত্নী বলে গ্রহণ করতে চাও রোসালিণ্ডকে।

—চাই। অর্ল্যাণ্ডোর উদ্‌গ্রীব জবাব।

—কখন ?

—যত দ্রুত পাদ্রী বিয়ে দেবে আমাদের।

—তবে বল, আমি স্ত্রী বলে গ্রহণ করলাম রোসালিণ্ডকে।

—রোসালিণ্ড, স্ত্রী রূপে তোমাকে গ্রহণ করলাম।

—আমি অর্ল্যাণ্ডো, তোমাকে পতিরূপে বরণ করলাম।

মেয়েটি পাদ্রীর চেয়ে কাজ সারল দ্রুত। বললো, অর্ল্যাণ্ডো, এখন বলো তুমি কতদিন ভালবাসতে রোসালিণ্ডকে ?

—চিরকাল—চিরকাল !

—উঁহুঁ অর্ল্যাণ্ডো, চির বলো না, বলো একদিন বলে যায় রোসালিণ্ড। এসব ভাবালুতা ক্ষণস্থায়ী। সত্যিও নয় পুরোপুরি, মিথ্যেও নয়। বোঝাতে চায় কথাটার ভিতর কতখানি শূন্যতা ঢক্ ঢক্ করে বাজছে। অর্ল্যাণ্ডো মানতে রাজী হয় না। চলে যুক্তি গড়া, যুক্তি-ভাঙা খেলা। সময় বয়ে যায়, এক সময় উঠতে হয় অর্ল্যাণ্ডোকে।

—ঘণ্টা দুয়েক দেরী হবে, ডিউক ডেকেছেন ভোজে, যেতেই হবে। ফিরবো দুটোর সময়।

—হায়, ঘণ্টা দুই যে কত দীর্ঘ সময় ! দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে রোসালিণ্ড। যা খুশী কর, যাও যেখানে খুশী। ইস আমার কেন মরণ হয় না ?

—লক্ষ্মীটি এখন আসি।

চলে যায় অর্ল্যাণ্ডো। সিলিয়া ছিল এতক্ষণের নির্বাক দর্শক।

এবার সে বললো—সই, এতক্ষণ ধরে মেয়ে হয়ে মেয়েদের কাঁধে কি দারুণ অপবাদ চাপালে বলতো ?

—তুই জানিস না সিলিয়া। ভালবাসায় আমি তলিয়ে গেছি কোথায়। ভেনাসের ঐ প্রেমের দেবতা ঐ কিউপিডই বলুক, কত গভীর এই প্রেম। যাই, আলিয়েনা—ছায়ার বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবি ওর কথা। চলে যায় পুরুষ বেশিনী রোসালিণ্ড।

একটুক্ষণ ওর দিকে চেয়ে থেকে সিলিয়াও চলে যায়। মেঘ-মেদুর শূন্যতা যেন তাকেও গ্রাস করেছে।

সতের

অরণ্যপ্রান্তে নির্বাসিত ডিউকের সভাসদ আজ উল্লসিত।

কেন না, ভোজন টেবিলে আজ পরিবেশিত হবে ফল-মূলের বদলে মৃগ-মাংস।

ডিউককে পরিচিত করানো হবে শিকারীর সঙ্গে। মুক্ত প্রকৃতির সন্তান বনবাসীরা এত তুচ্ছ উৎসবকে আন্তরিকতায় ভরিয়ে দেবে গানে গানে।

গম্ভীর মুখের জেক্স এসে দাঁড়ালো এই উৎসবে। মৃত হরিণ দেখে বললো—কে হত্যা করেছে একে ?

—আমি, কে এক সভাসদ বলে ওঠেন।

—এসো, ওকে বিজয়ী রোমান বীরের সম্মানে নিয়ে যাই ডিউকের কাছে। ওর মাথায় পরিয়ে দিই মৃত হরিণের দুই শিং। ওহে বনবাসী, তোমাদের গান বাঁধা হয়েছে উৎসবের ?

—হয়েছে, সবাই চেঁচিয়ে বলে।

বিদ্রূপে মুখর হয় জেক্‌স—তাহলে শুরু করে দাও, সুর থাক না থাক, সোরগোল উঠুক।

শুরু হলো গান। কবিত্বহীন। ছন্দ তার যেমন, ভাবও তেমনি।

হরিণ শিকারী কি চায় পুরস্কার?
হরিণের চামড়া পরতে চায় কি? আর শিং মাথায় দিতে?
এই তো শিরোপা-উপহার—তোমার জন্মের আগে
তোমার পূর্বপুরুষ পরতেন যা।
তোমার বাবাও পরেছেন—ঐ শিং শিং শিং
শিং নিয়ে কোরো না কোন ঠাট্টা।

ওরা গলা মিলিয়ে উদ্দাম হয়।

গান চলতে থাকে।

আঠারো

কথা দিয়েছিল, দুটোর সময় আসবে অর্ল্যাণ্ডো।

দুটো বেজে গেছে দেখা নেই তার। উতল আবেগে অধীরা রোসালিণ্ড।

ফুট কাটে সিলিয়া—আমার কি মনে হয় জান, দুরন্ত হৃদয় ও অগ্নিশুদ্ধ প্রেম নিয়ে তিনি এখন হয়তো তীর ধনুক ফেলে গভীর ঘুমে অচেতন। রোসা কে যেন এদিকে আসছে।

রোসালিণ্ডের মুখে মুহূর্তের জন্য আলো জ্বেলেই নিভিয়ে দিল আকাঙ্ক্ষিত সিলভিয়াস। সে সঙ্গে এনেছে ফিবির চিঠি।

ওকে চিঠি দিয়ে বললো—ফিবি দিয়েছে। জানিনা ভিতরে কি আছে। অনুমান করি হয়তো উষ্মা। লেখার সময় ফিবির মুখ

ছিল আষাঢ়ের মেঘের মত। আমি পত্রবাহক মাত্র। কোন দোষ নেই আমার।

চিঠি পড়ে জ্বলে উঠল রোসালিণ্ড। উফ্‌। এ চিঠি পড়লে ধৈর্যের সীমা থাকে মানুষের? কি? আমি কুচ্ছিত! অভদ্র! পৃথিবীতে আমি একমাত্র পুরুষ হলেও ও আমাকে রিফিউজ করতো? আমি কি ওর প্রেম প্রার্থী? কেন লিখেছে ও এ চিঠি? রাখাল, এচিঠি তোমার লেখা নয় তো?

—সত্যি, লিখিনি আমি, কি লেখা তাও জানিনা। সিলভিয়াস জানালো।

—তুমি যে কি করে ওর সঙ্গে প্রেম কর? ক্রোধে বলে যায় রোসা। ওর হাতের দিকে তাকিয়ে দেখেছো—ত্বক যেন পশুর চমড়া. রঙ ইটের মত। হঠাৎ দেখলে মনে হবে বুঝি দস্তানা পরিহিত। কিন্তু না, ওই তার আসল রং! সে যাকগে, এটা নিশ্চয়ই ওর জবানে কোন পুরুষের লেখা।

—উহুঁ, সিলভিয়াস প্রতিবাদ করে, ফিবিরই লেখা। শুনেছি ফিবি বড় নিষ্ঠুর, কি লিখেছে সে।

রোসালিণ্ড শোনাতে থাকে—

রাখাল বেশে তুমি এলে কোন দেবতা
কেন অহেতুক কুমারী মনে জ্বাল তপ্ত জ্বালা
সুষমা ভেঙে হে দেবতা, কেন মানুষ হলে
কিশোরী হৃদয়ে এতো দুঃসহ কান্না দিলে।

—এ তো ভর্ৎসনা নয়। সিলভিয়াস বলে ওঠে। কেউ দিয়েছে এমন গালাগাল?

সরোষে রোসালিণ্ড বলে—কি ভেবেছে ও? আমি কি জানোয়ার? মানুষ নই।

তুমি গাল দিলে, ভালবাসা হয়
চোখের ঘৃণায় ঘুম ভাঙে প্রেম

এলে তোমার চিঠি, হায়, কিযে করতো,
কি যে করতো আমার।
তুমি কথা বললে, হেসে, আহা, না জানি
ঘটতো কী যে আমার।
চোখের ঘৃণায় ঘুম ভাঙে প্রেম
তুমি গান দিলে, ভালবাসা হয়…

—এই কি গান? বলে ওঠে সিলভিয়াস।

সিলিয়া বলে ওঠে আচম্বিতে—বেচারী রাখাল।

রুষে ওঠে রোসা, এমন মেয়েকে ভালবাসলে বোন, পুতুলের মত তোমায় খেলতে হবে। ঠকতে হবে। যা খুশী করগে যাও, ভালবাসা আমার পুরুষত্ব নষ্ট করে দিয়েছে।

কথা শেষ হয় না। ঢোকে অলিভার। স্বেচ্ছাচারী ডিউকের অত্যাচারে সে এখন সম্পত্তিহীন, ঐশ্বর্যহীন, নির্বাসিত আর্ডেন বনবাসী।

সে শুধায়—বনপ্রান্তে জলপাই গাছের রাজ্যে এক কুটিরে থাকে এক কিশোর ও এক কিশোরী। বলতে পারো কোথায় পাবো তাদের? এখানে তো তোমরা দুজন, আচ্ছা, তোমরাই কি সেই…

হ্যাঁ হ্যাঁ, সিলিয়া আশ্বাস দেয়, আমরাই।

রোসা নামের কিশোরের জন্য অর্ল্যাণ্ডো পাঠিয়েছে এই রক্ত-রাঙা রুমাল।

কেমন ভয় পেয়ে যায় রোসালিণ্ড। এর মানে?

অলিভার বললো—আমার লজ্জা। আমার পরিচয়ই আমার লজ্জার কারণ উন্মোচন করবে।

অলিভার তার ঘটনা শুনিয়ে গেল—বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল অর্ল্যাণ্ডো। হঠাৎ চোখে এল কে এক হতভাগ্য মানুষ ঘুমুচ্ছে। ওক গাছের শেওলা ধরা গুড়ির ওপর তার মাথা। এক বিষধর সাপ তার গলা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ধরেছে। সে দংশনে উদ্যত।

অর্ল্যাণ্ডোকে দেখে সাপ পালালো। ওৎ পেতে ছিল এক সিংহী
মরা মানুষ তারা ছোঁয় না। ঘুমন্ত মানুষটি সামান্য নড়লেই, হিং
থাবা ঝাঁপিয়ে পড়বে। কাছে এসে দেখল অর্ল্যাণ্ডো ঘুমন্ত মানুষটি
আর কেউ নয়, তারই বড় ভাই অলিভার।

কাহিনীর মাঝে ঘৃণায় ফুঁসে ওঠে সিলিয়া—তার সেই প্রবঞ্চক
ভাই, অলিভার।

অস্থির রোসালিণ্ড বলে—তারপর। সে কি ফিরে গেল। সিংহী
শিকার হল তার ভাই?

ঘাড় নাড়লো অলিভার। দু'বার সে ফিরে যেতে চেয়েছিল
তবু দয়া, বড় মমতা নিভিয়ে দিল প্রতিশোধের আগুন। সিংহ'কে
হত্যা করলো সে। আর তখনই জেগে উঠলাম আমি।

—আ-প-নি? তার ভাই? সিলিয়া বিস্মিত।

—সে উদ্ধার করেছে আপনাকে? রোসার কণ্ঠ।

—হ্যাঁ, যে ভাইকে প্রতিশোধ চেয়েছিল হত্যা করতে তাকে
সিংহীর হিংস্র থাবা থেকে বাঁচালো পরম মুহূর্তে।

অর্ল্যাণ্ডো, রক্তাক্ত, দুর্বল, এতক্ষণ পরে অলিভার বললো—
অর্ল্যাণ্ডো জ্ঞানহীন। জ্ঞান হতে তার রোসার কাছে পাঠিয়েছে
ঐ লোহিত-উষ্ণ ভালবাসা, ঐ রুমাল।

মুহূর্তের মধ্যে খবর শুনে রোসালিণ্ড চেতনা হারালো, বোঝাতে
চাইল অলিভার, রক্ত দেখে অনেকেই অচেতন হতে পারে। ভ
নেই। সিলিয়া তথাপি বিমূঢ়—এ যে তার চেয়েও ঢের বেশী।

অবশেষে চোখ মেললো রোসালিণ্ড—আমাকে বাড়ীতে দি
এসো।

অলিভারের দিকে সিলিয়া তাকালো—ওকে প্লিজ, একটু হা
ধরে নিয়ে চল।

—আর তুমি রোসালিণ্ড, পুরুষ হয়েও তোমার অভাব পুরুষত্বের
হ্যাঁ, রোসালিণ্ডের গলাখানি এটারই অভাব। মশাই, আপনা

ভাইটিকে বলবেন কেমন নিখুঁত অভিনয় করেছি মূর্চ্ছা যাবার।

—এ কি ভান? অলিভার তো অবাক। তোমার চোখ মুখের বিবর্ণতা এখনো বলে দিচ্ছে এ ভান নয়, মূর্চ্ছা নয়।

—না না মশাই, অভিনয়, এ ভান সত্যি বলছি।

—তবে চল পুরুষের মত।

—হ্যাঁ হ্যাঁ এই তো যাচ্ছি।

—এ কি? সিলিয়া ফিসাফিসিয়ে জানায়, তোর মুখে কিন্তু সখী, এখনো বিশীর্ণতার ছাপ। এই যে মশাই, একটু আমাদের সঙ্গে আসবেন তো।

—আলবাৎ। যেতে যেতে অলিভার বললো, রোসালিণ্ড, তুমি চিঠি দেবে তো? ওর আর্জি মেনে নিলে কিনা, উত্তর আশা করে সে।

—পরে ধীরে সুস্থে দেওয়া যাবে, এখন গিয়ে বলবেন, আমি কিরকম অভিনয় করেছিলাম, কেমন?

রোসাকে ধরে নিয়ে যায় সিলিয়া।

উনিশ

আবার অরণ্য।

আর অরণ্যানী মানুষ।

বিয়ের বাঁধনে সরলা অড্রেকে বাঁধেনি নাগরিক বিদূষক টাচস্টোন।

বাধা দিয়েছিল নিজেই। আজও বিয়ের জন্য উন্মুখ অড্রে। টাচস্টোন নিত্যদিনের মত আজও ভোলাচ্ছে তাকে—ওসব পরে হবে ঢের অবসর পাওয়া যাবে বিয়ের।

অড্রে বললো—বুড়ো ভদ্রলোকটা যাই বলুক, ঐ পাদ্রীটা ভালই ছিল।

—দূর, বেটা একনম্বর পাজী, নচ্ছার, কিন্তু অড্রে, এ বনের এক যুবক জানায়, তোমাকে সে চায়।

—জানি, আমার ওপর কোন দাবী তার থাকতে পারে না। ঐ তো, ঐ আসছে সে।

উইলিয়াম এলো, অতি সাধারণ রাখাল। সে সম্ভাষণ জানাতেই ঠাট্টা শুরু হয় টাচষ্টোনের।

—আহা, করছো কি, টুপী খুলতে হবে না। তা বন্ধু, তোমার বয়স কত বলতো?

—পঁচিশ হল। উইলিয়ামের হাবাগোবা উত্তর।

—ভরা বয়স। উইলিয়াম তোমার নাম?

—আজ্ঞে, ঐ নামেই সবাই ডাকে।

—বাহ, চমৎকার নাম তো। এই বনের মানুষ তুমি?

—হুম। ভগবানকে ধন্যবাদ, এখানকার অধিবাসী আমি।

—আহা, বেশ বলেছো, বেশ। খুব ধনী বুঝি?

—না না, কোন রকমে চলে যায়।

—ভাল ভাল, তবে বেশী ভাল নয়, মোটামুটি ভাল। তুমি কি বুদ্ধিমান?

—ভাণ্ডারে অল্প অল্প কিছু আছে বৈকি।

—এইতো বুদ্ধিমানের মত কথা, এবার বলতো হে, এই কুমারীকে কি ভালবাসো তুমি?

—তা বাসি।

—তবে হাতে রাখো হাত। তুমি বিদ্বান তো?

—আজ্ঞে না।

—তবে জেনে রাখ, এক জনের প্রাপ্য অন্য কেউ পায় না। এর আশা ত্যাগ কর এক্ষুণি বুঝলে। নইলে, সোজা কথায় মরতে হবে.

সাবাড় হয়ে যাবে। মানে, আমিই সাবড়ে দেবো। বিষ দেবো, পেটানো কিংবা গুম খুন করবো।

নয়তো লড়াইয়ে ভেবে চোরা গোপ্তা চালাবো! খুব সাবধান, আগে ভাগে কেটে পড় প্রাণ নিয়ে।

অড্রে চোখ বড় করে বলে হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেটে পড়।

মুহূর্তে সব দাবী ছেড়ে উর্দ্ধশ্বাসে পালায় উইলিয়াম। এবং সেই পথে বুড়ো করিণ রাখাল এসে ঢোকে। খবর দেয় তার মনিব ওদের নাকি খোঁজাখুঁজি করছে। তবে তো জরুরী তলব।

টাচস্টোন বলে ওঠে—চল যাই।

কুড়ি

অলিভার বললো—আমি আলিয়েনাকে ভালবাসি। কত সামান্য পরিচয়, তার দরিদ্র, এইসব আকস্মিক ব্যাপার নিয়ে প্রশ্ন আলোচনা থাক।

তুমি শুধু রাজী হয়ে যাও। বাবার সমস্ত সম্পত্তি তোমাকে দিয়ে এখানেই কাটিয়ে দেব আমরা সারাজীবন। বল তুমি রাজী?

—রাজী। অর্ল্যাণ্ডো বললে, ঠিক আছে, কালই বিয়ে হোক। আলিয়েনাকে প্রস্তুত হতে বলো। অনুচরসহ ডিউক সবাইকে নিমন্ত্রণ করবো আমরা।

খুশী মনে চলে গেল অলিভার।

রোসালিণ্ড অস্থিরতা নিয়ে ছুটে এল—আঘাত লেগেছে কোথায়? উফ, বড় দুঃখ পেলাম ঐ ঝোলানো হাত দেখে। ভেবে ছিলাম, হয়তো সিংহী ক্ষত দিয়েছে হৃদয়ে।

রোসালিণ্ড হঠাৎ শুধায়—হ্যাঁগো, তোমার দাদা আমার অভিনয়ের কথা কিছু বলে নি?

—হ্যাঁ, তার চেয়েও সাঙ্ঘাতিক কথা বলেছেন।

লাজুক নত মুখে সে হাসলো—জানি, তবে কাল আমি স্থান নেবো তোমার রোসালিণ্ডের।

—কেমন ? তুমি যদি আন্তরিক ভালবাসায় চেয়ে থাক, তবে পাবে তোমার রোসাকে। আমি তার অবস্থা জানি। তাই বলছি, কাল যখন তোমান দাদা আলিয়েনার সঙ্গে বসবে বিবাহ বাসরে তখন তোমার বিয়ের সানাইও বেজে উঠবে। আমি হাজির করবো রোসাকে।

অর্ল্যাণ্ডো বিস্ময়ে স্তব্ধ—তুমি পাগল হয়ে যাও নি তো গানিমেড ?

—দোহাই, যাদুকর হতে পারি আমি, তবু আমার জীবন আমার প্রিয়। কাল একটু সাজ গোজ কোরো। বন্ধুদের নিমন্ত্রণ কোরো। জেনো কাল তোমারও বিয়ে এবং রোসালিণ্ডের সঙ্গেই। ঐ ত্মাখো আরেক কাপল আসছে।

ঢুকলো সিলভিয়াস এবং ফিবি।

ফিবির কণ্ঠে ঝগড়ার সুর। শুরু হয় ভালবাসার খুনসুটি। চলে প্রেমের হা-হুতাশ, চাওয়া এবং না পাওয়ার দীর্ঘ আলোচনা। অনেক সময় জোটে।

শেষে রোসালিণ্ড বললো—ঢের হয়েছে, আর না। জ্যোৎস্নায় আমরা ঢের ডেকেছি নেকড়ের ডাক। সিলভিয়াস, সম্ভব হলে সাহায্য করবো তোমায়। সম্ভব হলে, তোমাকেও ফিবি, ফিরিয়ে দিতাম ভালবাসার প্রতিদান। যদি কোন মেয়েকে বিয়ে করি, তোমাকেই করবো।

কালই আমার বিয়ে। অর্ল্যাণ্ডো, খুশী করবো তোমাকে—হ্যাঁ, কাল তোমারও বিয়ে। কাল অবশ্যই দেখা করবে আমার সঙ্গে, কেননা তোমার চাই রোসালিণ্ডকে।

সিলভিয়াস, তুমি আসবে, কেননা, তুমি ভালবাসা ফিবিকে।

শুধু আমি কোন মেয়েকে ভালবাসিনা তাই আসবো এখানে। আজ আসি।

একুশ

সবার প্রতীক্ষিত কাল মিলেছে আগামীকালে। কার কপালে কে আছে কে জানে?

ছদ্মবেশীনি রোসালিণ্ড কি খেল দেখাবে সেদিন? টাচষ্টোনের কণ্ঠে মিশেছে আনন্দ উদ্দাম—কাল আমাদের মধুমাস, অড্রে, আমাদের বিয়ে। আমরা তো সংসার করতে চাই।

অড্রে বললো—চেয়েছি দুজনা মিলে বাঁধবো সুখের নীড়। ঐ ভাখো কারা যেন এদিকে আসছে।

দুজন ডিউকের অনুচরের প্রবেশ মাত্রই বলে ওঠে টাচষ্টোন—আরে আসুন আসুন।

ওরা বসলো, সম্বোধন বিনিময় শেষ হলে বললো—এবার গান শুরু হোক, আনন্দ চলুক। উৎসবকে স্বাগত জানাই ঐকাতানে।

দুজনে শুরু করে গান—

প্রেমের কিশোর ছিল এক,
আর তার প্রেমের কিশোরী
আহা, মরে যাই! মরে যাই!
মধুমাস এল ঐ
সবুজ ক্ষেত পেরিয়ে
চলে যায় তারা চলে যায়
আসে মধুমাস
আংটি বদলের সুসময়
পাখি গান গায়

টুং টাং, টুং টাং
রাই সরষের হলুদ মাঠ
ওরা গো ঢেলে গেয়ে যায় গান
জীবনে তো ক্ষণিক ফুল,
বসন্ত মুকুল
ভালবাসার এই তো
পূর্ণতার বয়স।
ভালেবেসে ওরা
যে মধুমাস
আহা, মরে যাই!
মরে যাই!

গান ভাল লাগে না টাচস্টোনের।

ওদের বলে, কি জানেন মশাই। এমন বেসুরো এবং বাজে বিষয় বস্তুর গান শুনে আর সময় নষ্ট করতে চাই না। যাকগে, ঠাকুর আপনাদের দিন সুকণ্ঠ, মঙ্গল করুন। এখন আমরা যাই। এসো অড্রে।

বাইশ

আজ সেই মধুমাস।

অরণ্য সেজেছে অপরূপ সুষাময়, ফুলে-ফলে।

দক্ষিণা বাতাস বড় উন্মনা।

আজ উৎসব মিলনের। সুখের। সমাপ্তির।

অনেকে আর্ডেনের অরণ্যে উপস্থিত। আলাপ চলছে গভীর। এ সময়ে আসে ফিবি, সিলভিয়াস এবং রোসালিণ্ড।

ডিউকের দিকে চেয়ে রোসালিণ্ড বলে—আপনি বলেছেন,

রোসালিণ্ডকে আনলে তার সঙ্গে বিয়ে দেবেন অর্ল্যাণ্ডোর।

—স্বেচ্ছায় দেব, রাজ্য থাকলে মেয়ের সঙ্গে রাজ্যও দিতাম। ডিউক বললেন।

এবার সে অর্ল্যাণ্ডোর দিকে ফিরলো—তুমি বলেছো, তাকে তুমি গ্রহণ করবো, তাই তো?

এবার রোসালিণ্ডের চোখ ফিবির দিকে—আর তুমি? আমি রাজী হলে বিয়ে করবে আমাকেই।

—তাতে যদি মরণ হয় তবু, ফিবির উত্তর।

—আমি কিন্তু রাজী না হলে বিয়ে করতে হবে এই রাখালকেই।

—আমি রাজী।

সিলভিয়াসের দিকে ঘুরলো রোসালিণ্ড—তারপর তুমি? ফিবি রাজী হলে তাকে বরণ করে নেবে, তাই না?

সিলভিয়াস নিরামত্ত হয়ে বলে—ওকে গ্রহণ করা অথবা মরণ বরণ করা আমার কাছে দুই-ই সমান। তবু আমি বিয়ে করবো ওকেই।

—এখন এই বাধাগুলি ভেঙে, কথা রাখবো আমার। রোসালিণ্ড বলে যায় আপনি, মহামান্য ডিউক, কন্যা সম্প্রদান করার জন্যে তৈরী থাকুন। ডিউকের কন্যাকে বধূবরণের জন্য প্রস্তুত হও অর্ল্যাণ্ডো সিলভিয়াস ফিবি তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি ভুলো না। আমি একটু অন্তরালে যাই, সব সন্দেহের মেঘ কেটে যাবে এক্ষুণি।

রোসালিণ্ড আর সিলিয়া চলে গেল আড়ালে।

ডিউক ওদের গমন পথে চেয়ে রইলেন মগ্ন-দৃষ্টিতে। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল মেয়ের কথা। ঐ রাখাল বালকের মুখের আদলের সঙ্গে কি কোথাও মিল আছে তার?

নির্ভয়ে অর্ল্যাণ্ডো জানালো, প্রথমে রাখাল বালককে দেখে তাই-ই মনে হয়েছে। কিন্তু ও তো বন্য। জঙ্গলের অধিবাসী। ওর বাবা ছিলেন মস্ত যাদুকর। তাই তাঁর কাছে কিছু নিষিদ্ধ বিদ্যা শিখেছে ও।

অল্যাণ্ডো হয়তো আরও বলত। কিন্তু তার আগেই সবার নিবদ্ধ করে বলে ওঠে জেক্‌স—ঐ আর এক যুগল দম্পতি। অতি মুর্খ, আহা ওরা এসেছে। বাইবেলের গোপী পতির ভেলায় এ যেন সেই প্রলয় তাড়িত জনস্রোতে ঠাঁই নিতে আসছে।

এম অড্রে ও টাচস্টোন। ওরা সবাইকে নমস্কার জানালো।

ডিউককে জেক্‌স জানালো—বহুরূপ পোষাক পরা এই হল ভাঁড় ভেতরটাও এর বর্ণালী রঙে থৈ থৈ করছে। বনে হামেশাই দেখা মেলে ওর। এককালে, ইনি নাকি কোন ডিউকের সভাসদ ছিলেন, অন্ততঃ ইনি তাই বলেন।

তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে টাচস্টোন—বিশ্বাস না হয়, পরীক্ষা করে দেখুন। আমি দারুণ কৌশলী বন্ধুর কাছে, শত্রুর কাছে ভদ্র। নাচতে পারি। লিখেছি এক দীর্ঘ নারী স্তুতি। ফতুর করেছি তিনটে দর্জিকে। চার চারটে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়েছিলাম, একটায় প্রায় নেমেও পড়েছিলাম।

—কি করে বিবাদ মিটলো? জেক্‌স প্রশ্ন করে।

—আমরা মুখোমুখি লড়াইয়ের জন্য দাঁড়িয়ে—হঠাৎ খুঁজে বার করা হল। বিবাদটার বীজ লুকিয়ে আছে সাত নম্বর কারণে।

—সাত নম্বর কারণ! ফের বলে ওঠে জেক্‌স—সেটা আবার কি?

ডিউক ওকে বললেন—তোমাকে বেশ ভাল লাগছে।

অমনি টাচস্টোন বললে—আমারও ভাল লাগছে আপনাকে. এখন আমি এই প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে হারিয়ে গেলাম। এখন ওদের মতই দিব্যি করবো পরক্ষণেই ভাঙবো। বিধান মেনে বিয়ে করবো, আবেগে উত্তেজনায় বিয়ে ভাঙবো।

মশাইরা, আমার বাগদত্তা বউ এই অড্রে। বিচ্ছিরি দেখতে। কেউ যাকে পছন্দ করবে না তাকেই গ্রহণ করছি—কেন না, সতীত্ব এবং একনিষ্ঠতা গরীবের মত বাসা বেঁধেছে ঐ কুশ্রী দেহে।

ঠিক যেমনটি বিশ্রী ঝিনুকের ভিতর গোপনে জন্ম নেয় দুর্লভ মুক্তা।

এরকম বুদ্ধিদীপ্ত কথায় সবাই বাহবা দিল। হেসে লুটোপুটি অনেকেই।

—কিন্তু ভাঁড়মশাই, তোমার সাত সম্বর সেই কারণটা? জেক্‌স খেই ধরিয়ে দিল।

প্রতি উত্তরে টাচষ্টোন জানালো—পরোক্ষ মিথ্যে ভাষণের চেয়ে খুব বেশী আমি এগোই নি। আর উনিও প্রত্যক্ষ পর্যন্ত এসে থমকে গেছে। শেষে দ্বন্দ্বযুদ্ধের ভান করে সরে পড়লাম।

এভাবেই কথায় কথায়, কখন আসে মিলনেরা। পুষ্প শোভিত আর্ডেনের অরণ্যে উতলা বাতাস চিঠি বিলি করে বসন্তের।

এল সেই মিলনের অনাঘ্রাত মধুমাস।

গ্রীক বিবাহ দেবতা হাইমেনকে এখন, এই বিবাহ লগ্নে বড় প্রয়োজন।

সেই হাইমেন—বেশধারী বনচরকে সঙ্গী করে আনে রোসালিণ্ড ও সিলিয়া। এ রোসালিণ্ড, পুরুষ নয়, ছদ্মবেশধারী নারী।

হাইমেন বেশে গাইতে গাইতে ঢোকে বনচর। মাদল বাজে।

পৃথিবী দুরন্ত, যখন শান্ত হয় প্রকৃতি
দেখা দেয় ছন্দ যখন স্বর্গে
তখন আনন্দের কল্লোল
কন্যাকে তোমায় গ্রহণ কর ডিউক
তাকে নিয়ে এসেছেন বিবাহ-ঠাকুর হাইমেন
যাতে, তার হৃদয় বদল হয়েছে যার সাথে
তার হাতে সমর্পণ করতে পারো তাকে।

ডিউকের কাছে ছুটে এল রোসালিণ্ড—বাবা, বাবা, আমিই তোমার মেয়ে।

তাকালো অর্ল্যাণ্ডোর দিকে—তোমাকে ভালবাসি। তাইতো নিজেকে তোমার হাতে সঁপে দিলাম।

—যদি আমায় ঠিক বলে, ডিউক বললেন, তবে, এই আমার মেয়ে।

অর্ল্যাণ্ডো বললো—আমার চোখ যদি ভুল না দেখে তো, এই-ই আমার রোসা।

শেষে রোসা বলে—ডিউক যদি আমার বাবা না হয়, আমার বাবা নেই। অর্ল্যাণ্ডো যদি স্বামী না হয়। বিয়ে করবো না। আর কোন মেয়েকে বিয়ে করতে হলে ফিবি, তোমাকেই করবো।

স্তব্ধ হও, শান্ত হও, গোলমাল আর চলবে না, অদ্ভুত ঘটনা জাল ভেঙ্গে আমি দেবো সহজ উপসংহার? চারজোড়া চারজোড়া নিয়ে মিলিয়ে দাও বিবাহ বন্ধনে। অবশ্য তারা এরই মধ্যে যদি না ভাঙে অঙ্গীকার।

(অর্ল্যাণ্ডো ও রোসালিণ্ডকে) এস, এস—হাত মিলিয়ে দিই হাতে— কোন বিঘ্ন যেন ছিন্ন না করতে পার এ বন্ধন।

(অলিভার ও সিলিয়াকে) এস, এস,—হাতে রাখ হাত। তোমাদের হৃদয় হোক অভেদ।

(ফিবিকে)—তোমাকে বিয়ে করতে হবে ঐ রাখালকেই। নচেৎ এক নারী হবে তোমার স্বামী।

(অড্রে ও টাচস্টোনকে)—এই মিলন হল তোমাদের যেমন মিলন হয় শীত ও ঝড়ে।

গাই বিবাহের গান।

তোলো মধুর গুঞ্জন।

একে অপরকে ডেকে শুধাও।

এমন ঘটনা কি করে?

যুক্তি এসে ভাঙুক, যত বিস্ময় সাঙ্গ হোক খেলা।

দেবতার রাণী জুনো,

মিলন বিবাহ তাঁর মাথার মুকুট
ঘরে ঘরে এই বন্ধনে
নগরী মানুষে ভরা।
(এসো) গাই বিবাহের গান,
দেবতাদের জানাই শ্রদ্ধা।

সিলিয়াকে ডিউক পরম আন্তরিকতায় ভ্রাতুষ্পুত্রী বলে কাছে টেনে নিলেন।

এমন সময় সংবাদ এলো। রাজ্যের সম্ভ্রান্ত সবাই আর্ডেন বনবাসী শুনে ডিউক ফ্রেডারিক এক বিশাল সেনাদল নিয়ে আসছিলেন। উদ্দেশ্য ভাইকে বন্দী করে হত্যা করা।

কিন্তু বন পথে দেখা হল এক বৃদ্ধ তপস্বীর সঙ্গে। তাঁর উপদেশ নিতে লেগে গেলেন ফ্রেডারিক।

ত্যাগ করলেন এ পাপ সঙ্কল্প। ঠিক করলেন তিনি হবেন সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী। জ্যেষ্ঠকে ফিরিয়ে দেবেন রাজ্য এবং নির্বাসিতরাও ফিরে পাবে হারানো সম্পত্তি।

সন্দেশ বাহককে সাদরে অভ্যর্থনা করলো সবাই।

সম্পত্তি ফিরে পেল অলিভার।

রাজ্য পেল অর্ল্যাণ্ডো। কিন্তু যে বাজনার দ্রিমি দ্রিমি রোল কানে আসছে। সুতরাং সংবাদ বাহক মেতে উঠল আনন্দে। সবাই আনন্দে উদ্বেল, উচ্ছ্বসিত।

কেবল জেকস বিষণ্ণ,- সত্যি মত পরিবর্তন করেছেন ডিউক ? রাজ্য ছেড়েছেন ? তাহলে আমি সঙ্গী হবো। অনেক কিছু শেখার থাকে নব-দীক্ষিতের কাছে। আপনারা আনন্দ করুন ডিউক। বহু দুঃখ করেছেন, এ আনন্দ আপনাদের প্রাপ্য।

অর্ল্যাণ্ডো ? একান্ত বিশ্বাসে পেলে যে প্রেম তাতে স্নান করে শুদ্ধ হও। ডুবে থেকো বন্ধু।

অলিভার ? সম্পদ ও ভালবাসা দুই-ই এখন তোমার মুঠোয়।

সিলভিয়াস ? সুখের হোক তোমার বিবাহিত জীবন।

আর টাচষ্টোন ? তোমার তো দাম্পত্য কলহময় জীবনের বয়েস বড় জোর মাস দুয়েক। তবু আনন্দে থেকো বন্ধু।

আমার জন্যে এ আনন্দ নয়। তোমরা আনন্দ কর বন্ধু—সেই আমার সুখ। আমি চললাম।

—না, জেক্‌স, তুমি যেও না এই সুখের দিনে—ডিউকের কণ্ঠে অনুরোধ ঝরে যায়।

ঐ পরিত্যক্ত গুহাই আমার স্থান। কিছু বলতে হলে ওখানে যাবেন—প্রতীক্ষায় রইলাম।

চলে গেল জেক্‌স। আনন্দ ঘন মিলনের মধুমাসে কোথাও কি ছায়া পড়ল বিষাদের ?

চীৎকার করে উঠলেন ডিউক,—নাচ—বাজাও—গাও। চলুক বিবাহ উৎসব। এই সুখ হোক অনন্ত কালের। এই আনন্দ হোক চিরস্থায়ী। বাজাও, তোমরা বাজাও—

বেজে উঠল বাদ্য। বাতাসে মিশল ঐক্যতানের সুর।

শুরু হল যুগল দম্পতির উদ্দাম নৃত্য।

বিষাদ মেঘের ফাঁকে ঝিলিক দিল বর্ষণ শেষের সোনালী রৌদ্র।

সমাপ্ত